জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

4



জঙ্গলগড়ের চাবি

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৯৪
এপ্রিল, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৮ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

দাম : ২০ টাকা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে

স্নেহের উপহার

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই :

তাজমহলে এক কাপ চা
রক্তমাংস
দুই নারী
সোনালি দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীর গোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
আকাশ দস্যু
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
শ্রেষ্ঠ কবিতা

জঙ্গলগড়ের চাবি

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ সকালে। রাস্তা থেকে হকার খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে একটু আগে, সেটা পড়ে আছে দোতলার বারান্দার কোণে।

সন্তু কিন্তু ঘুমিয়ে আছে এখনো। আজ যার রেজাল্ট বেরুবার কথা, তার কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা উচিত? একটু চিন্তা-ভাবনা নেই?

আসলে সন্তু সারা রাত্ত প্রায় ঘুমোতেই পারেনি। ছটফট করেছে বিছানায় শুয়ে। মাঝে-মাঝে উঠে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখেছে ভোর হল কিনা। বুকের মধ্যে টিপ-টিপ শব্দ। ভয়ে সে সত্যি-সত্যি কাঁপছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, পরীক্ষা দেবার সময় সন্তুর একটুও ভয় হয়নি, তারপর যে এই তিন মাস কেটে গেল তখনও একদিনের জন্য কোনো ভয়ের চিন্তা মনে আসেনি। কাল সন্ধেবেলা সুমন্ত্র যেই বলল, "জানিস, আজই রেজাল্ট আউট হতে পারে!" তার পর থেকেই সন্তুর বুক-কাঁপা হয়ে গেল। যদি সে ফেল করে!

সব কটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালই সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছে সন্তু। কিন্তু কাল রাত্তিরেই শুধু তার মনে হল, যদি উত্তরগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? অঙ্কগুলো যদি সব ভুল হয়? অঙ্কের পেপারের সব উত্তর সন্তু মিলিয়ে দেখেছে বটে, কিন্তু মাঝখানের প্রসেসে যদি কিছু লিখতে ভুল হয়ে থাকে?

ফেল করলে যে কী লজ্জার ব্যাপার হবে, তা সন্তু ভাবতেই পারছিল না। বন্ধুরা সব এগারো-বারোর কোর্স পড়তে চলে যাবে। আর সে পড়ে থাকবে পুরনো ক্লাসে! নিচু ক্লাসের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে তাকে! সন্তু ফেল করলে মা-বাবা-কাকাবাবু-ছোড়দিরা সবাই সন্তুর দিকে এমন অবহেলার চোখে তাকাবেন, যেন সন্তু একটা মানুষই নয়!

ফেল করার সবচেয়ে খারাপ দিক হল, তা হলে আর কাকাবাবু নিশ্চয়ই তাকে অন্য কোনো অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না! বাবা বলবেন, পড়াশুনো নষ্ট করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো? কক্ষনো চলবে না!

এই সব ভাবতে ভাবতে, সারা রাত ছটফটিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই ভোরের একটু আগে সন্তু একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকাবাবু ছাড়া এ বাড়িতে সবাই একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। তা ছাড়া ভূপাল থেকে ছোড়দি বেড়াতে এসেছে বলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে। আজ আবার রবিবার। কারুর উঠবার তাড়াও নেই। সন্তু কাল রাত্তিরে কারুকে বলেওনি যে আজ তার রেজাল্ট বেরুবে।

কাকাবাবু ভোরবেলা উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন।

প্রথমে ঘুম ভাঙল ছোড়দির।

বিয়ের আগে ছোড়দিই সকাবেলা চা তৈরি করে বাবা আর মাকে ঘুম থেকে তুলত। আজও ছোড়দিই চা বানিয়ে এনে ঠিক সেই আগের মতন বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "চা কিন্তু রেডি!"

বাবা চায়ের টেবিলে এসেই অভ্যাস মতন বললেন, "খবরের কাগজটা কই রে?"

ছোড়দি বারান্দাটা ঘুরে দেখে এসে বলল, "এখনো কাগজ দেয়নি!"

আসলে হয়েছে কী, বারান্দায় কয়েকটা ফুলগাছের টব আছে তো। তারই একটা টবের পেছনে গোল করে বাঁধা কাগজটা লুকিয়ে আছে।

চা পানের সময় কাগজ পড়তে না পারলে বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন, "কী যে হয়েছে আজকাল সব ব্যবস্থা, ঠিক সময়ে কাগজ আসে না! আর এক কাপ চা কর!"

মা বললেন, "সন্তু এখনো ওঠেনি? ওকে ডাক্।"

ছোড়দি বলল, "ডাকছি। সন্তু কি এখনো সকালে দুধ খায়, না অন্য কিছু খায়?"

মা বললেন, "পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে ওরও এখন ওর কাকার মতন খুব চা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু দুধ খেতে চায় না।"

ছোড়দি আবার চায়ের জল চাপিয়ে ডাকতে গেল সন্তুকে।

বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সন্তুর পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। সেই জন্য এখন সন্তুকে ছাদের ঘরটা একলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়।

ডাকতে এসে ছোড়দি দেখল সন্তুর চোখ দুটো বোঁজা থাকলেও দুটো জলের রেখা নেমে আসছে চোখের তলা দিয়ে। বুকটা মুচড়ে উঠলো ছোড়দির। আহা রে, ছেলেটা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখছে।

সন্তুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছোড়দি ডাকল, "এই সন্তু, সন্তু! ওঠ্!"

দু'বার ডাকতেই সন্তু চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে? মুখখানা এমন কেন? কী স্বপ্ন দেখছিলি?"

এবারেও সন্তু কোনো উত্তর দিল না। মনে-মনে বলল, আজকের সকালের পর আর তাকে কেউ ভালোবাসবে না।

ছোড়দি আদর করে সন্তুর হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে বলল, "অমন শুক্‌নো মুখ করে আছিস্ কেন? চল্, নীচে চল।"

হঠাৎ সন্তুর মনে পড়ল, আজ রবিবার। আজ তো স্কুল খোলা থাকবে না। রেজাল্ট তো আনতে হবে স্কুল থেকে। তা হলে আর-একটা দিন সময় পাওয়া গেল। কালকের আগে তার রেজাল্ট জানা যাবে না।

দ্বিতীয় কাপ চা পেয়ে বাবা বললেন, "আঃ, এখনো কাগজ এল না?"

ছোড়দি বলল, "দেখছি আর একবার।"

ছোড়দি ছুটে গেল বারান্দায়।

সন্তুর জন্য মা স্পেশাল চা বসিয়ে দিয়েছেন। অনেকখানি দুধের

মধ্যে একটুখানি চা। তা-ও কাপে নয়, বড় গেলাসে। সেই গেলাসটা ধরে সন্তু গোঁজ হয়ে বসে আছে।

এবারে ছোড়দি টবের আড়াল থেকে কাগজটা পেয়ে গেল। সুতো খুলে প্রথম পাতাটা পড়তে-পড়তে এগিয়ে এসে বলল, "আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে!"

সন্তু যেন পাথর হয়ে গেছে, তার নিশ্বাস বন্ধ।

মা বললেন, "তাই নাকি? এই সন্তু, তোদের আজ রেজাল্ট বেরুবে, তুই জানতিস না?"

সন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে এমনভাবে একটু আস্তে মাথা নাড়াল যার মানে হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয়।

বাবা বললেন, "তোর রেজাল্ট তো স্কুলে আসবে! এক্ষুনি স্কুলে চলে যা!"

সন্তু খসখসে গলায় বলল, "আজ রবিবার!"

ছোড়দি বলল, "আমাদের সময় তো কলেজ স্ট্রীটে রেজাল্ট ছাপা বই বিক্রি হত। এখন হয় না?"

বাবা বললেন, "কী জানি! কিন্তু রবিবার হলেও আজ ইস্কুল খোলা রাখবে নিশ্চয়ই। ছেলেরা রেজাল্ট আনতে যাবে না?"

ছোড়দি বলল, "এই তো ফার্স্ট বয় আর ফার্স্ট গার্লের ছবি বেরিয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে সৌমিত্র বসু, নরেন্দ্রপুর। আর মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে কাকলি ভট্টাচার্য, বীরভূম। সেকেণ্ডেরও নাম দিয়েছে। ওমা, এক সঙ্গে দু'জন সেকেণ্ড হয়েছে, ব্র্যাকেটে, অভিজিৎ দত্ত আর সিদ্ধার্থ ঘোষ। সন্তু, তুই এদের কারুকে চিনিস নাকি রে?"

সন্তুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি যেন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ক্রমশই তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, সে ফেল করেছে!

কান্না লুকোবার জন্য সন্তু বাথরুমে ছুটে চলে গেল।

ছোড়দির কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে নিলেন বাবা। অন্য খবরের বদলে তিনি রেজাল্টের খবরটাই পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। খবরের

কাগজের লোকেরা কী করে আগে থেকে খবর পেয়ে যায়? কালকের রাত্তিরের মধ্যেই ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়েদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে হাজির হয়েছে, ছবি তুলেছে, তাদের বাবা-মায়ের ইণ্টারভিউ নিয়েছে। কাকলি ভট্টাচার্যের মা বলেছেন, তাঁর মেয়ে লেখাপড়াতেও যত ভাল, খেলাধুলোতেও তত। অনেক মেডেল পেয়েছে।

কাগজ পড়তে-পড়তে বাবা হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, "এঃ রাম!"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

বাবা বললেন, "দেখেছ কাণ্ড! আমাদের সন্তুটা ফিফ্‌থ হয়েছে।"

মা আর ছোড়দি দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠে বলল, "অ্যাঁ,? কী বললে?"

বাবা বললেন, "এই তো প্রথম দশজনের নাম দিয়েছে। তার মধ্যে দেখছি সন্তুর নাম।"

মা আর ছোড়দি ততক্ষণে দু'পাশ দিয়ে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মা বললেন, "কই, কই?"

ছোরদি বলল, "এই তো, সুনন্দ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুল!"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এ আমাদের সন্তুই তো?"

মা বললেন, "তবে আবার কে হবে! ওর নাম রয়েছে, স্কুলের নাম রয়েছে···সন্তু, এই সন্তু, কোথায় গেলি?"

বাবা বললেন, "ওদের স্কুলে ঐ নামে অন্য কোনো ছেলে নেই তো?"

মা বললেন, "আহা হা! অদ্ভুত কথা তোমার। ওদের ক্লাসে ঠিক ঐ নামে আর কেউ থাকলে সন্তু আমাদের এতদিন বলত না? সন্তু, কোথায় গেল! এই সন্তু—"

বাবা কাগজটা সরিয়ে রেখে দিয়ে বললেন, "ছি ছি!"

মা দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বাবার

মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তার মানে ? ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, আর তুমি বলছ ছিছি ?"

বাবা বললেন, "ফিফ্‌থ হল। ফার্স্ট হতে পারল না ?"

মা বললেন, "ফিফ্‌থ হওয়াই কি কম নাকি ? যথেষ্ট ভাল করেছে। আমি তো আশাই করিনি—"

বাবা বললেন, "যে ফিফ্‌থ হতে পারে, সে আর-একটু মন দিয়ে পড়লে ফার্স্টও হতে পারত !"

ছোড়দি বলল, "ভাল হয়েছে সন্তু ফার্স্ট হয়নি ! ও ফার্স্ট হলে সৌমিত্র বসু সেকেণ্ড হত ! তা বলে তার বাবার মনে দুঃখ হত না ?"

মা বললেন, "ছেলেটা বাথরুমে ঢুকে বসে রইল, নিশ্চয়ই এখনো কিছুই জানে না ! এই মুন্নি, ওকে ডাক না।"

ছোড়দি ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজায় দুম্-দুম্ করে কিল মেরে বলল। "এই সন্তু, সন্তু !"

সন্তু কোনো সাড়া দিল না।

ছোড়দি বলল, "শিগগির বেরো ! কি বোকার মতন এতক্ষণ বাথরুমে বসে আছিস !"

সন্তুর ইচ্ছে, সে আজ সারাদিন আর বাথরুম থেকে বেরুবে না। এইখানেই বসে থাকবে।

"দরজা খোল না। কী হয়েছে, জানিস ? কাগজে বেরিয়েছে, তুই ফিফ্‌থ হয়েছিস !"

একটা পিংপং বল্ যেন সন্তুর বুকের মধ্যে নাচানাচি করতে লাগলো। কী বলল ছোড়দি ? সে ভুল শোনেনি তো !

খটাস্ করে বাথরুমের দরজা খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী বললে ?"

"তুই ফিফ্‌থ হয়েছিস !"

"ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে ?"

"কাগজে নাম ছাপা হয়েছে তোর। দেখবি আয় বোকারাম !"

ফিফ্‌থ হওয়ার ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না সন্তু। তার মানে সে পাশ করেছে? সত্যি সত্যি পাশ! ইস্কুলের পড়া শেষ!

সন্তু ছুটে গেল কাগজ দেখতে।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠলো। সন্তুর এক মামা ফোন করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কাগজে মাধ্যমিকের রেজাল্টে এক সুনন্দ রায় চৌধুরীর নাম দেখছি। ওকি আমাদের সন্তু নাকি?"

ছোড়দি বলল, "হ্যাঁ। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের নামও তো রয়েছে পাশে।"

মামা বললেন, "কোথায় সন্তু। দে না তাকে ফোনটা। তাকে কন্‌গ্রাচুলেশান্‌স জানাই।"

মায়ের মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। বাবার মুখখানা কিন্তু দুঃখী-দুঃখী। তিনি বললেন, "যাই বলো, ফিফ্‌থ হওয়ার কোনো মানে হয় না। ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে পারলে তবু একটা কথা। নইলে ফিফ্‌থই হও আর টুলেফ্‌থই হও, একই কথা!"

ছোড়দি বলল, "মোটেই এক কথা নয়। দশ জনের মধ্যে নাম থাকা মানে তো সন্তু স্কলারশিপ পাবে।"

মা বললেন, "পাবেই তো! তাও তো এ-বছর ওর কতগুলো দিন সেই নষ্ট হয়েছে নেপালে! পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই ও বেশি পড়ে—।"

সন্তু ফোন ছেড়ে দিতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুই ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই আমরা খুশি হতুম রে সন্তু! তুই যে এতখানি ভাল করবি···। যা, বাবাকে প্রণাম কর!"

ছোড়দি বলল, "মা, দারুণ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। সন্তুর সব বন্ধুদের ডেকে—"

সন্তু এখনো ভাল করে কথা বলতে পারছে না। সে এতই অবাক হয়ে গেছে! পাশ করা সম্পর্কেই তার সন্দেহ ছিল, আর সে কিনা স্কলারশিপ পেয়ে গেল!

বাবা বললেন, "ফার্স্ট হলে কাগজে ওর ছবি ছাপা হত!"

মা বললেন, "ফের তুমি ওরকম কথা বলছো? নেপালে সেবার ঐ রকম কাণ্ড করবার পর প্রত্যেকটা কাগজে সন্তুর ছবি বেরিয়েছিল তোমার মনে নেই? এর চেয়ে অনেক বড় ছবি।"

এই সময় কাকাবাবু ফিরলেন বাইরে থেকে। ঘরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার। এত গোলমাল কিসের?"

২

কাকাবাবুর চেয়ে সন্তুর বাবা মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার অনেক তফাত। কাকাবাবু যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া কাঁধ, চওড়া কব্জি। আর পুরুষ্টু গোঁফটার জন্য কাকাবাবুকে মিলিটারি অফিসারের মতন দেখায়। সন্তুর বাবাও বেশ লম্বা হলেও রোগা-পাতলা চেহারা, কোনদিন গোঁফ রাখেননি, মাথার চুলও একটু-একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কাকাবাবু যেমন অল্প বয়েস থেকেই পাহাড়-পর্বতে আর দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন, বাবার স্বভাব ঠিক তার উল্টো। উনি বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না, অফিসের সময়টুকু ছাড়া। জীবনবীমা সংস্থায় উনি অ্যাকচুয়ারির কাজ করেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ, দারুণ অঙ্কের জ্ঞান লাগে।

দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতন। সব রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন দু'জনে।

কাকাবাবুর ডাকনাম খোকা!

সন্তুদের কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ এসে এই নাম শুনে অবাক হয়ে যায়। অনেকে হেসে ফেলে। অতবড় একজন জাঁদরেল চেহারার মানুষের নাম খোকা হতে পারে? কিন্তু কাকাবাবুও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন, তখন ঐ নাম তাঁকে মানাত। বড় হলেও তো আর ডাকনাম বদলায় না।

সন্তুর রেজাল্টের খবর শুনে কাকাবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, পাশ করেছে? কী আশ্চর্য কথা! সন্তু তো তাহলে খুব গুণের ছেলে। কখন পড়া-শুনো করে দেখতেই পাই না!"

বাবা বললেন, "যা-ই বলো। ফার্স্ট হলে আমি খুশি হতুম। পাশ তো সবাই করে!"

মা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বললেন, "দেখেছ, দেখেছ! বছরের মধ্যে ক'মাস বাইরে কাটিয়ে এসেও সন্তু যে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, তাতে ওর বাবার আনন্দ নেই!"

বাবা বললেন, "তুই-ই বল খোকা, যখন ফিফ্‌থ্‌ই হল, তখন চেষ্টা করলে ফার্স্ট হতে পারতো না? ফার্স্ট আর ফিফ্‌থের মধ্যে হয়তো বড় জোড় কুড়ি-পঁচিশ নম্বরের তফাত!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো জীবনে কোনদিন স্ট্যাণ্ড করিনি! সন্তুর তবু কাগজে নাম উঠেছে···অবশ্য দাদা তুমিও···বলে দেব, দাদা, বলে দেব সেই কথাটা?"

বাবা অমনি কথা ঘোরাবার জন্য বললেন "ঠিক আছে, ঠিক আছে, সন্তু যা করেছে যথেষ্ট। এখন কোন্ কলেজে ভর্তি হবে সেটা ঠিক করো।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কী? কী বলবে বলছিলে? চেপে যাচ্ছ কেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "দাদা, বলে দিই?"

বাবা বললেন, "আঃ খোকা, তুই কী যে করিস! ওসব পুরনো কথা—"

কাকাবাবু তবু বললেন, "জানো বৌদি, দাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "অ্যাঁ?"

সন্তু এতক্ষণ লজ্জায় মুখ গুঁজে বসেছিল, সে-ও মুখ তুলে তাকালো। ছোড়দিও অবাক হয়ে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

মা বললেন, "সত্যি? এ-কথা তো আমি কোনোদিন শুনিনি!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি! আমাদের সময় তো স্কুল ফাইনাল ছিল না। তখন ছিল ম্যাট্রিক। দাদাকে সবাই এখন পণ্ডিত মানুষ হিসেবে জানে, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, দাদা কিন্তু সত্যিই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "তখন দাদু কী করেছিলেন? দাদু তো খুব রাগী ছিলেন, মেরেছিলেন বাবাকে?"

দাদু অর্থাৎ ঠাকুর্দাকে সন্তু চোখেই দেখেনি, তিনি মারা গেছেন সন্তুর জন্মের আগে। দাদু সম্পর্কে অনেক গল্প সে শুনেছে। বাবা আর দাদুর এই নতুন কাহিনীটি শোনবার জন্য সে উদগ্রীব হল।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের বাবা খুব রাগী ছিলেন ঠিকই। আমরা কেউ পড়াশুনোয় একটু অমনোযোগী হলেই উনি বলতেন, আর কী হবে, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বেয়ারার চাকরি করবি! আমার খেলাধুলোয় বেশি ঝোঁক দিল বলে পড়াশুনোয় মাঝে-মাঝে ফাঁকি দিতুম, সেইজন্য বাবার কাছে খুব বকুনি খেতুম, কিন্তু···"

বাবা অ-খুশি মুখ করে কাকাবাবুর কথা শুনছিলেন, এবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "তুই অনেক মারও খেয়েছিস বাবার হাতে। সে-কথা বলছিস না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমি মারও খেয়েছি অনেকবার। কিন্তু দাদা বরাবরই পড়াশুনোয় খুব ভাল। সেই দাদা যে ম্যাট্রিকে ফেল করবে, তা কেউ ভাবেইনি। আসলে হয়েছিল কী, অঙ্ক পরীক্ষার দিন দাদা আইনস্টাইনের মতন নতুন থিয়োরি দিয়ে সব কটা অঙ্ক করেছিল। প্রত্যেকটা অঙ্কের উত্তর লিখে ছিল প্রথমে, তারপর প্রসেস দেখিয়েছে —এক্জামিনার রেগে-মেগে জিরো দিয়ে দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুবার দিন মা আর আমাদের এক পিসি দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওঁরা ভাবলেন, বাবা রেগে-মেগে বোধহয় রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবেন। সেই জন্য দাদাকে লুকিয়ে রাখা হল ঠাকুর ঘরে। বাবা কিন্তু দাদাকে খুঁজলেনও না। সারাদিন মন খারাপ করে শুয়ে রইলেন। তারপর সন্ধেবেলা মাকে বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার খরচ বেঁচে গেল। ও ছেলেকে আর আমি পড়াব না। ওকে চায়ের দোকানের চাকরি খুঁজে নিতে বলো তোমরা! বাবা সাঙ্ঘাতিক জেদি আর এক-কথার মানুষ। কিছুতেই আর তাঁর মত ফেরানো গেল না। আমাদের ইস্কুলে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যে তাঁর ঐ ছেলেকে আর ফেরত নেবার দরকার নেই।"

ছোড়দি জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হল ?"

"দাদা তখন ঠিক করল মনুমেন্টের ওপর থেকে ঝাঁপ দেবে !"

বাবা বললেন, "কী বাজে কথা বলছিস, খোকা ? মোটেই আমি ওরকম···"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ দাদা, আমার আজও মনে আছে। তুমি আমাকে ঐ কথা বলেছিলে। আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ভাবছিলুম মাকে জানিয়ে দেব। যাই হোক, দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চন্দননগরে আমাদের মামাবাড়িতে। সেই-খান থেকেই পরের বছর পরীক্ষা দেয়। পরের বছর কী হয়েছিল বলো তো !"

ছোড়দি বললেন, "জানি। বাবা ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল !"

মা বললেন, "আমরা এতদিন জেনে এসেছি যে, তুমি সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাত্র। কিন্তু তোমারও যে এসব কলঙ্ক আছে তা তো আমাদের কোনোদিন বলো নি !"

কাকাবাবু বললেন, "একবার ফেল করে ভালই হয়েছিল দাদার পক্ষে। দাদা ভাল ছাত্র ছিল বটে, কিন্তু ফার্স্ট হবার মতন ছিল না। ফেল করে অভিমান হল বলেই—"

বাবা বললেন, "না। মোটেই না। প্রথমবারই আমার ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল, একজামিনার আমার অঙ্ক বুঝতে পারেননি !"

ছোড়দি জিজ্ঞেস করলো, "পরের বার বাবা যে ফার্স্ট হলেন, সে খবর পেয়ে দাদু কী বললেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা ফার্স্ট হওয়ায় আমার বাবা হঠাৎ উল্টে আমার ওপর চোটপাট শুরু করে দিলেন। আমায় ডেকে বললেন, পারবি ? তুই তোর দাদার মতন পারবি ? তোর দাদার পা-ধোওয়া জল খা, তবে যদি পাশ করতে পারিস !"

সবাই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

এই রকম ভাবে আড্ডায় সকালটা কেটে গেল। সন্ধেবেলা সন্তুর নেমন্তন্ন এক বন্ধুর বাড়িতে।

সন্তুর বন্ধু আজিজের বোন রেশমা গত মাসে জলে ডুবে গিয়েছিল। সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

আজিজরা কলকাতায় পার্ক সার্কাসে থাকলেও ওরা প্রায়ই যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে ওদের একটা চা-বাগান আছে। গত মাসে সেই চা-বাগান থেকে ওরা অনেকে মিলে গিয়েছিল ডায়না নদীর ধারে পিকনিক করতে। রেশমার বয়েস মাত্র সাত বছর, সে যে কখন চুপি চুপি খেলা করতে করতে জলে নেমেছে, তা কেউ লক্ষও করেনি। ডায়না নদীতে যখন জল থাকে, তখন বড় সাঙ্ঘাতিক নদী, খুব স্রোত। রেশমা সেই স্রোতে ভেসে যাবার পর আজিজের মামা প্রথমে দেখতে পান। তিনি চেঁচামেচি করে উঠলেন, সবাই তখন নদীর ধার দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। কাছেই একটা জেলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল, সে রেশমাকে দেখে জাল ছুঁড়ে আটকে ফেলে। আর একটু দূরেই ছিল একটা বড় পাথর। সেখানে ধাক্কা লাগলেই রেশমার মাথা একেবারে ছাতু হয়ে যেত!

প্রায় অলৌকিক ভাবেই বেঁচে গেছে রেশমা। সেইজন্যই এবারে তার জন্মদিন করা হচ্ছে খুব ধূমধামের সঙ্গে।

খুব ফুর্তির সঙ্গেই সন্তু গেল নেমন্তন্ন খেতে।

আজিজদের বাড়িটা মস্ত বড়। আর ওদের আত্মীয়-স্বজনও প্রচুর। তারা অনেকেই সন্তুকে চেনেন। সন্তুর কয়েকজন বন্ধুও এসেছে। আজিজের বাড়ির লোকরা কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করছেন, সন্তু, কী রকম রেজাল্ট হলো? সন্তুকে নিজের মুখে কিছু বলতে হয় না। আজিজ কিংবা অন্য কোনো বন্ধু আগে থেকেই বলে ওঠে, জানো না, ও ফিফ্থ হয়েছে। কাগজে আমাদের ইস্কুলের নাম বেরিয়েছে এই সন্তুর জন্য।

তখন তাঁরা সবাই 'বাঃ বাঃ' বলে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন সন্তুর।

সন্তুর একটু-একটু গর্ব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু লজ্জাও হচ্ছে খুব। যেন এই বিষয়টা নিয়ে কেউ আলোচনা না করলেই ভাল হয়। ফিফ্থ হওয়াটাই বা এমন কী ব্যাপার!

কালকের সন্ধের সঙ্গে আজকের সন্ধের কত তফাত। আজ কত

আনন্দ আর হৈ হৈ, আর কালকে সে ফেল করার দুশ্চিন্তায় একেবারে চুপসে কাচু হয়ে ছিল। মানুষের জীবনের পরপর দুটো দিন যে ঠিক এক রকম হবেই, তা কেউ বলতে পারে না।

এক সময় সন্তু ভাবল, কেন মিছিমিছি অত ভয় পাচ্ছিল কাল? ফেল করলেই বা কী হত? তার বাবাও তো ফেল করেছিলেন। ফেল করলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না। মনের জোর রাখাটাই আসল ব্যাপার।

আজিজদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আগে অনেক রকম খেলা হল। তার মধ্যে শেষ খেলাটা হল বন্দুক ফাটানো।

অন্তত দুশোটা বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে সারা বাড়িটা। লাল টুকটুকে ভেলভেটের ফ্রক পরা রেশমাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা পরীর মতন। জন্মদিনের কেক কাটার পর ফুঁ দিয়ে যখন মোমবাতিগুলো নেভানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওপর থেকে আপনা-আপনি একটা বেলুন খসে পড়ল সেখানে। জ্বলন্ত মোমবাতির কাছাকাছি আসতেই দুম্‌ করে ফেটে গেল সেটা।

রেশমা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "কী মজা! কী মজা!"

তারপরই সে আবদার ধরল, "কী মজা! কী মজা! আরও বেলুন ফাটিয়ে দাও! সব কটা বেলুন ফাটিয়ে দাও!"

রেশমার বাবা সুলেমান সাহেব বললেন, "না, না, এখন ফাটিও না, সুন্দর সাজানো হয়েছে, কাল সকালে…"

রেশমা তবু বলল, "না, ফাটিয়ে দাও! সব কটা ফাটিয়ে দাও!"

আজকের দিনে রেশমার আবদার মানতেই হয়। সেইজন্য অন্যরা হাতের কাছে যে যে-কটা বেলুন পেল, ফটাস ফটাস করে ফাটাতে শুরু করে দিল।

কিন্তু বেশির ভাগ বেলুনই ওপরে ঝোলানো, হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল আর খিলখিল করে হাসতে লাগল রেশমা।

আজিজ টুক করে নিয়ে এল ওর এয়ারগানটা।

সেটা উঁচিয়ে তুলে বলল, "এবার ছ্যাখ রেশমা, সব কটা কী রকম ফাটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আজিজের অত ভাল টিপ নেই। সে চার-পাঁচটা গুলি ছুঁড়লে একটা বেলুন ফাটে।

তখন শুরু হয়ে গেল কমপিটিশান। পর পর দশটা গুলি ছুঁড়ে কে সবচেয়ে বেশি বেলুন ফাটাতে পারে। কেউই তিন চারটের বেশি পারল না। আজিজের মামা ফাটালেন পাঁচটা।

সন্তু এয়ারগানটা হাতে নিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, "সবাই এক এক করে গুনুক! আমি দশটায় ঠিক দশটা ফাটাব।"

এ-ব্যাপারে গর্ব করতে সন্তুর কোন লজ্জা নেই। সে আসল রিভলভারে গুলি ছুঁড়েছে। এ তো সামান্য একটা এয়ারগান!

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, এক!

সন্তু সত্যি-সত্যি পরপর দশটা বেলুন ফাটাতে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। সন্তু বীরের মতন এয়ারগানটা তুলে দিল পাশের বন্ধুর হাতে।

খুব মজা হল অনেক রাত পর্যন্ত।

পরদিন সকালটা আবার একেবারে অন্য রকম।

সন্তু সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। কাকাবাবু এখনো মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। বাবা যথারীতি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করছেন।

এই সময় পাড়ার দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে পাগলের মতন দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিতে লাগল সন্তুদের বাড়ির দরজায়।

বাবা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? এই যে, তোমরা ওরকম করছ কেন!"

ছেলে দুটি বলল, "শিগগির আসুন! পার্কে কে যেন কাকাবাবুকে গুলি করেছে!"

৩

বাবা ওপরের বারান্দা থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, "অ্যাঁ ? কী বললে ? কী সর্বনাশ ! সন্তু কোথায় ?"

সন্তু ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে তীরের মতন ছুটতে আরম্ভ করেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা, তারপর ডান দিক বেঁকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পার্কটায় পৌঁছানো যায়। সন্তু সেখানে পৌঁছে গেল দেড় মিনিটে।

পার্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু তার এক পাশে একটা কবরখানা। আর একদিকে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, একটা বারোতলা বাড়ির লোহার কঙ্কাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে রাশি-রাশি ইঁট।

সেই ইঁটের স্তূপের কাছে এক দঙ্গল মানুষের ভিড় দেখেই বোঝা গেল যে, ঘটনাটা সেইখানেই ঘটেছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে একটা কুকুরের অবিশ্রান্ত ডাক।

সন্তু ভিড়ের মধ্যে গোঁত্তা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখলো একটা ইঁটের পাঁজার পাশে কাকাবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। গুলি লেগেছে কাঁধের বাঁ দিকে, পাতলা সাদা জামাটায় পাশাপাশি দুটো কালো গোল দাগ, তার চার পাশে রক্ত।

কাকাবাবু সন্তুর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন রোজ। সেই রকুকু কাকাবাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে, সন্তুকে দেখতে পেয়েই সে পাগলের মতন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সন্তু কাকাবাবুর গায়ে হাত দিল না, কান্নাকটিও শুরু করল না। তাকে এখন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না।

সে রকুকুর গলায় চাপড় মেরে বলল, "তুই এখানে থাক। দেখিস, কেউ যেন কাকাবাবুর গায়ে হাত না ছোঁয়ায়।"

রকুকু সন্তুর সব কথা বোঝে। সে আবার গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর মাথার কাছে। সন্তু আবার ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে ছুটল।

ডঃ সুবীর রায় তখন চেম্বারে বেরুবার জন্য সবে মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন, সন্তু ঝড়ের মতন ঢুকে এল তাঁর ঘরে। এক হাতে তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্সটা টপ্ করে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ডঃ সুবীর রায়কে ধরে টানতে টানতে বলল, "শিগগির চলুন! ডাক্তার মামা, এক্ষুনি···"

ডঃ সুবীর রায় অবাক হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? কী হয়েছে?"

"কিছু বলার সময় নেই। কাকাবাবু—"

"কাকাবাবু? কোথায়···দাঁড়া, জুতোটা পরে নিই।"

"না, জুতো পরতে হবে না!"

খালি পায়েই ডঃ সুবীর রায় ছুটতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। তাঁর বাড়িও পার্কের কাছেই।

ততক্ষণে সন্তুর বাবা আর মা পৌঁছে গেছেন। আর এসেছে একজন পুলিশের কনস্টেবল।

ডঃ সুবীর রায় হাঁটু গেড়ে বসলেন কাকাবাবুর দেহের পাশে। আস্তে আস্তে উল্টে দিলেন কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর মুখে একটা দারুণ অবাক হবার ভাব।

যে-সমস্ত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অনেকেই কাকাবাবুকে চেনে। অনেকেই এখানে সকালে বেড়াতে আসে। সবাই নানান কথা বলাবলি করছে। কিন্তু আগেই যে একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত সে-কথা কারুর মনে পড়েনি।

দু'তিনজন নাকি স্বচক্ষে দেখেছে কাকাবাবুকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে। গুলির আওয়াজ হয়েছিল তিনবার, অর্থাৎ একটা গুলি ফস্কে গেছে। কিন্তু কে গুলি করেছে, তা বোঝা যায়নি। কাছাকাছি তো কেউ ছিল না, কিংবা কারুকে পালাতেও দেখা যায়নি।

একজন বলল, "নিশ্চয়ই কেউ কবরখানায় লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।"

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু পার্কে বেড়াতে এসে এই ইঁটের পাঁজার কাছে কেন এসেছিলেন। এখানে বালি আর খোয়া ছড়ানো, এই জায়গাটা তো হাঁটার পক্ষেও ভাল নয়।

ডঃ সুবীর রায় এর মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে বললেন, "সন্তু, এক্ষুনি ওঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে অপারেশান করাতে হবে। এখনো বেঁচে আছেন···আমার ড্রাইভার বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে···তুই গিয়ে ডেকে আন বরং!"

সন্তু বলল, ঐ যে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে·· যদি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাই···"

বাবা বললেন, "সেই ভাল, সময় বাঁচবে!"

সবাই মিলে ধরাধরি করে কাকাবাবুকে তোলা হল ট্যাক্সিতে। রকুকু কী যেন বুঝে আরও জোরে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকছে, সেও সঙ্গে যেতে চায়।

রকুকুকে জোর করে মায়ের সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

নার্সিং হোমে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপারেশানের পর জানা গেল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডঃ সুবীর রায় ছাড়া আরও দু' জন বড় ডাক্তারও ছিলেন অপারেশানের সময়। তাঁরা কেউ কখনো এরকম কাণ্ড দেখেননি।

কাকাবাবুর শরীরে যে গুলিদুটো ঢুকেছে, সেগুলি মানুষ মারবার জন্য নয়। বাঘ-সিংহের মতন বিশাল শক্তিশালী প্রাণীদের এই রকম গুলি মেরে ঘুম পাড়ানো হয়।

তিনজন ডাক্তারই দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর জন্য তো সঙ্গে-সঙ্গে অ্যান্টিডোট দেবার কথা, নইলে বাঁচানো যায় না। অথচ অনেক সময় কেটে গেছে।

যদিও ভরসার কথা এই যে কাকাবাবুর এখনও নিশ্বাস পড়ছে।

সুন্দরবনে দু'একটা বাঘকে গুলি করে ঘুম পাড়াবার কথা অনেকেই শুনেছে, কিন্তু কলকাতা শহরে সকালবেলা পার্কে কোনো মানুষকে এরকম ভাবে গুলি করবে কে? কেন?

ডঃ তিমির বরাট একবার সুন্দরবনের একটা বাঘকে এই রকম গুলি মেরে অজ্ঞান করার সময় সেখানে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ জানবার জন্য তাঁকে ফোন করা হল পি জি হাসপাতালে।

ডঃ তিমির বরাট তো ঘটনাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। তারপর বলতে লাগলেন, "পেশেণ্ট এখনো বেঁচে আছে? কী বলছেন অপানারা? এ যে অসম্ভব! ঠিক আছে; আমি এক্ষুনি আসছি। আপনারা ততক্ষণে চীফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট মিঃ সুকুমার দত্তগুপ্তকেও একটা খবর দিন। তাঁর এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে।

সুকুমার দত্তগুপ্তও টেলিফোনে ঐ একই কথা বলতে লাগলেন। ঘুমের গুলি? আপনাদের ভুল হয়নি তো? সেই গুলি শরীরে গেলে তো কোনো মানুষের পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব! মিঃ রায়চৌধুরীকে অমি চিনি, ওঁকে এইরকম ভাবে···

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলেন ওঁরা দু'জনে। আর বারবার বলতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!'

সুকুমার দত্তগুপ্ত বললেন, "এই রকম গুলি বিদেশ থেকে আসে, এ তো কোনো সাধারণ লোকের পাবার কথা নয়।"

ডঃ সুবীর রায় বললেন, "সারা পার্কের মধ্যে সকালবেলা কারুকে গুলি করে, তারা কি সাধারণ লোক?"

সমস্ত ডাক্তারদের অবাক করে কাকাবাবু এর পরেও তিনদিন বেঁচে রইলেন অজ্ঞান অবস্থায়।

চতুর্থ দিনে তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

তবু আরও দু' দিন তাঁর ঘুম-ঘুম ভাব রইল, ভাল করে কথা বলতে পারেন না, কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়।

আস্তে-আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দুটো অবশ হয়ে রইল। হাতে কোনো জোর পান না। কোনো জিনিস শক্ত করে ধরতে পারেন না।

অনেক ওষুধপত্র দিয়েও আর হাত দুটো ঠিক করা গেল না। ডাক্তাররা বললেন, "আর কিছু করবার নেই। এখন ভাগ্যের ওপর

ছেড়ে দিতে হবে, যদি আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যায়।"

এতদিন পর সন্তু রাত্তিরবেলা তার ছাদের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদল।

কাকাবাবুর হাত দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়া তো তাঁর মৃত্যুর চেয়েও খারাপ!

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া, শুধু মনের জোরে আর ঐ লোহার মতন শক্ত হাত দু'খানার জোরে তিনি কত পাহারে-পর্বতে পর্যন্ত উঠেছেন। কিন্তু এখন? আর তিনি কোনো অভিযানে যেতে পারবেন না। তিনি এখন অথর্ব।

এর মধ্যে কলকাতার পুলিশের বড় বড় কর্তারা আর দিল্লি থেকে সি. বি. আই.-এর লোকেরাও কাকাবাবুর কাছে এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে গেছেন।

কাকাবাবু সবাইকেই বলেছেন যে, কে তাঁকে ঐ রকম অদ্ভুত গুলি দিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। আততায়ী একজন না কয়েকজন তাও তিনি জানেন না, কারণ কারুকেই তিনি দেখতে পাননি। তাঁকে গুলি করা হয়েছে পেছন দিক থেকে।

সকলেরই অবশ্য ধারণা হল যে, ঘুমের গুলি মারার কারণ একটাই হতে পারে। কাকাবাবুকে কেউ বা কারা অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

তবে তারা নিয়ে গেল না কেন? সকালবেলা পার্কে কিছু নিরীহ লোক ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখের সামনে দিয়েই যদি তারা কাকাবাবুকে তুলে নিয়ে যেত, কেউই বাধা দিতে সাহস করত না।

মিঃ ভার্গব নামে সি. বি. আই.-এর একজন অফিসার কাকাবাবুর কাছে রোজই যাতায়াত করছিলেন। তিনিই বললেন যে স্বাস্থ্য সারাবার জন্য কাকাবাবুর কোনো ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার।

সন্তুর বাবা এবং মা দু'জনেই এতে খুব রাজি।

ঠিক হল যে সবাই মিলে যাওয়া হবে পুরীতে। সন্তুর মামাদের একটা

বাড়ি আছে সেখানে। সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই। বাবা ছুটি নিয়ে নিলেন অফিস থেকে। ছোড়দিরও খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোড়দিকে ফিরে যেতে হল ভূপালে।

শনিবার দিন রাত ন'টায় ট্রেন। একটু আগেই বেরুনো হল বাড়ি থেকে।

ট্যাক্সিটা যখন রেড রোড ছাড়িয়ে রেডিও স্টেশনের পাশ দিয়ে বেঁকছে, সেই সময় একটা সাদা রঙের জীপ গাড়ি তীব্র বেগে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন লোক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হুকুম দিল, "গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাও।"

সেই জীপ থেকে নামলেন মিঃ ভার্গব।

তিনি বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের প্ল্যানটা একটু বদল করতে হবে। আপনার পুরী যাওয়া হবে না।"

কাকাবাবু কোনো কথা না বলে শুধু চেয়ে রইলেন মিঃ ভার্গবের দিকে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী ব্যাপার।"

মিঃ ভার্গব বললেন, আমরা খবর পেয়েছি, পুরীতে কয়েকজন সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর এই ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক বলা না গেলেও তারা ঠিক এই সময়ই পুরীতে গেল কেন, তা আমাদের জানতে হবে। যদি ওরা মিঃ রায়চৌধুরীর কোনো ক্ষতি করে···সেই জন্য আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।"

বাবা বললেন, "তা হলে কি আমরা ফিরে যাব।"

মিঃ ভার্গব বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে পুরী যেতে পারেন।

সন্তু বলল, "আমি কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গেই যাব!"

মিঃ ভার্গব হেসে বললেন, তা জানি! সেরকম ব্যবস্থাই হয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আর-একজন যাবেন. এঁর নাম প্রকাশ সরকার,

ইনি একজন তরুণ ডাক্তার। সত্ত পাশ করেছেন···”

একটুক্ষণ কথা বলেই কাকাবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে তোলা হল জীপটায়। সন্তু ভাগ্যিস আলাদা একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিয়েছিল, তাই কোনো অসুবিধে হল না।

জীপটা ছুটলো অন্য দিকে। সোজা একেবারে এয়ার পোর্ট।

সেখানে আর্মির একটা স্পেশাল ছোট প্লেনে উঠল ওরা। তখনো কোথায় যাচ্ছে, সন্তু জানে না। নামবার পর দেখল যে, জায়গাটা গৌহাটি।

প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে ধরে নামালো কাকাবাবুকে। এবার উঠতে হবে আর-একটা জীপে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন হয়ে গেছি, না রে? হাঁটতে পারি না, একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত ধরতে পারি না। আমায় নিয়ে কী করবি তোরা?”

৪

প্লেনের সিঁড়ি থেকে কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নামিয়ে আনা হল।

কাছেই টারম্যাকের ওপর অপেক্ষা করছে একটা বেশ বড় জীপ। তার পেছন দিকে দুই সীটের মাঝখানে বিছানা পাতা। প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে মিলে কাকাবাবুকে সেখানে শুইয়ে দিল খুব সাবধানে। সন্তু সেখানেই বসল। আর প্রকাশ সরকার গিয়ে বসল সামনের দিকে। সেখানে ড্রাইভারের পাশে আর-একজন লোক বসে ছিল।

সেই লোকটি প্রকাশ সরকারকে নিচু গলায় কিছু বলবার পরই চলতে শুরু করল গাড়ি।

সন্তু এর আগে কখনো আসামে আসেনি। কিন্তু আসামের পাহাড় আর জঙ্গল সম্পর্কে অনেক গল্পের বই পড়েছে। হাতি, গণ্ডার, বাঘ··· কী নেই আসামে! সেইজন্য আসামের নাম শুনলেই তার রোমাঞ্চ হয়।

সে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিন্তু চারপাশে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

সন্তু ভেবেছিল, এয়ারপোর্টে যখন নেমেছে, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি শহর থাকবে। আলো দেখা যাবে।

কিন্তু গাড়িটা শহরের দিকে গেল না। মাঝে-মাঝে দুটো একটা আলো দেখা গেলেও বোঝা যায়, গাড়িটা চলে যাচ্ছে লোকালয়ের বাইরে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা আবার ছুটল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

ঘণ্টাখানেক পরে সন্তু অবাক হয়ে দেখল, তাদের গাড়ি আবার একটা এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে টারম্যাকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

কাকাবাবু ঘুমোননি, চুপচাপ শুয়ে ছিলেন।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কোথায় এলুম, বল্ তো, সন্তু ?"

সন্তু বলল, "আর-একটা এয়ারপোর্ট···নামটা পড়তে পারিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝতে পারলি না ? আবার সেই আগের এয়ারপোর্টেই ফিরে এলুম ! ঐ যে পাশাপাশি দুটো আলো, তার মধ্যে একটা দপ্ দপ্ করছে !"

সন্তু দেখল, তাই তো ! ঠিকই। অসুস্থ, শোয়া অবস্থাতেও কাকাবাবু এটা লক্ষ করেছেন ঠিক।

প্রকাশ সরকার এদিকে এসে বিনীতভাবে বলল, "স্যার, আপনাকে আবার একটু কষ্ট করে নামতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপার কী ? এত সাবধানতা কিসের ? আমি তো একেবারে অথর্ব হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি না, কোনো কিছু ধরতে পারি না, আমায় নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা থাকবে ?"

প্রকাশ সরকার বলল, "আমাদের দেশের পক্ষে আপনার জীবন খুবই মূল্যবান। আপনার যদি কোনো বিপদ হয়·· সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলতো, সন্তু ?"

সন্তুও তো কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্য-অন্য বার কাকাবাবু নিজেই প্রথম দিকে সন্তুর কাছে অনেক কথা গোপন করে যান। এবার কাকাবাবু নিজেই জানেন না কী হচ্ছে! একই এয়ারপোর্টে দু'বার তাঁকে কেন আনা হল? কারুর চোখে ধুলো দেবার জন্য? কিন্তু তারা যে প্লেনে আসামে চলে আসবে, সে-কথা তো সন্ধের আগে কেউ জানতই না।

কাকাবাবুকে আবার নামানো হল জীপ থেকে।

সেই সেনাবাহিনীর বিমানটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সেটাতেই আবার উঠতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, একটু টাট্‌কা হাওয়া খেয়ে নিই। আসামের হাওয়া খুব ভাল।"

সত্যি-সত্যি তিনি মুখটা হাঁ করে হাওয়া খেতে লাগলেন।

এক দিকে প্রকাশ সরকার, আর-এক দিকে সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। সন্তু একটু লম্বায় ছোট বলে কাকাবাবুকে একদিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে।

সেই অবস্থায় প্রায় প্রকাশ সরকারকে শুনিয়ে-শুনিয়েই কাকাবাবু সন্তুকে ফিসফিস করে বললেন, "মনে কর, এরাই যদি গুণ্ডা হয়, এরাই হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের কোথাও গুম্ করতে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে কী করবি?

সন্তু আড়চোখে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল।

প্রকাশ সরকার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "এ কী বলছেন, স্যার? এরা সব আর্মির লোক, এটা আর্মির জীপ, ঐটা আর্মির জেট···দিল্লি থেকে স্পেশাল অর্ডার এসেছে বলেই আপনাকে···"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ! কিছুই বলা যায় না!"

প্রকাশ সরকার এবার রীতিমত আহত হয়ে বলল, "স্যার, আপনার এখনো অবিশ্বাস হচ্ছে? মিঃ ভার্মার চিঠি আছে আমার কাছে। যদি দেখতে চান···"

"যাব। চলো!"

আবার ওঠা হল সেই ছোট বিমানের মধ্যে। কাকাবাবুকে তাঁর সীটে বসবার পর তিনি চোখ বুজে রইলেন।

প্রকাশ সরকার সন্তুর পাশে বসে পড়ে বলল, "তোমার সঙ্গে আমার ভাল করে আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাদের সব কটা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। সেই আন্দামানে···কিংবা নেপালে, এভারেস্টের কাছে, আর একবার সেই কাশ্মীরে···তুমি তো দারুণ সাহসী ছেলে!

এই রকম কথা শুনলে সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে থাকে। কী যে উত্তর দেবে তা বুঝতে পারে না।

প্রকাশ আবার বলল, "আর তোমার কাকাবাবু, উনি তো জীনিয়াস! একটা পা নেই বলতে গেলে···তবু শুধু মনের জোরে উনি কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। উনি কোনো বিপদকেই গ্রাহ্য করেন না!

সন্তু এবার বলল, "কিন্তু কাকাবাবুর এখন হাতেও জোর নেই।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার, আমি সঙ্গে রয়েছি, কোনো চিন্তা নেই। আমার ওপর নির্দেশ আছে, উনি যখন যা চাইবেন, তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্তত এক মাস যদি বিশ্রাম নিতে পারেন···"

"এক মাস?"

"তা তো লাগবেই। আরও বেশি হলে ভাল হয়। কেন, তুমি সঙ্গে থাকতে পারবে না?"

"আমার যে কলেজ খুলে যাবে।"

"তুমি কলেজে পড়ো বুঝি?"

সন্তু আবার লজ্জা পেয়ে গেল। সে এখনো ঠিক কলেজের ছাত্র হয়নি। তবু 'কলেজ' কথাটা উচ্চারণ করতে তার বেশ ভাল লাগে।

এই সময় কাকাবাবু চোখ খুলে বললেন, "এই যে বৈজনাথ, শোনো!"

প্রকাশ একবার এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ!"

"আসছি, স্যার! ইয়ে, মানে, স্যার, আমার নাম তো বৈজনাথ নয়, এখানে বৈজনাথ বলে কেউ নেই। আমার নাম প্রকাশ, প্রকাশ সরকার।"

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমি বৈজনাথ নও! ঠিক বলছ? ভারী আশ্চর্য তো!"

"বৈজনাথ কে স্যার? সন্তু, তুমি ঐ নামে কারুকে চেনো?"

সন্তু দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ঠিক আছে। তোমার কী নাম বললে যেন? প্রকাশ? শোনো প্রকাশ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি একটু ডাবের জল খাব।

"ডাবের জল? এখানে কি ডাবের জল পাওয়া যাবে? কোল্ড ড্রিংক্স আছে বোধহয়।"

"আমি ডাবের জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না!"

"কিন্তু স্যার, রাত্তিরবেলা ডাবের জল খাওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়!"

"কেন, কী হয়?"

"কেউ খায় না। খেলে গলা ভেঙে যায়!"

"তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে? যাই হোক, আমি রাত্তিরেও ডাবের জল খাই, আমার গলা ভাঙে না।"

"প্লেনের মধ্যে তো ডাবের জল দেবার উপায় নেই।"

"তা হলে সামনের স্টেশানে থামাও! সেখান থেকে ডাবের জল জোগাড় করো। এই যে বললে, আমি যখন যা চাইব, তুমি তা-ই দেবার ব্যবস্থা করবে!"

প্রকাশ অসহায় ভাবে সন্তুর দিকে তাকালো।

সন্তুও প্রায় নির্বাক হয়ে গেছে। কাকাবাবু এ কী রকম ব্যবহার

করছেন? কাকাবাবু কোনোদিন কারুর নাম ভুলে যান না। অথচ প্রকাশকে ডাকলেন বৈজনাথ বলে। ডাবের জল খাওয়ার জন্য আবদার, এ তো কাকাবাবুর চরিত্রের সঙ্গে একদম মানায় না! তারপর উনি বললেন, 'সামনের স্টেশান'! উনি কি প্লেনটাকে ট্রেন ভেবেছেন নাকি?

প্রকাশ বলল, "স্যার, আমরা আর আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। সেখানে খুব চেষ্টা করব যদি ডাবের জল পাওয়া যায়। তার আগে কি একটা কিছু কোল্ড ড্রিংক্ কিংবা এমনি জল খাবেন?"

"না।"

কাকাবাবু আবার চোখ বুঁজলেন।

একটু পরে সন্তু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

প্রকাশ বলল, "একটু বাদেই তো নামব। তখন দেখতে পাবে।"

চোখ না খুলেই কাকাবাবু বললেন, "আগরতলা, তাই না? একে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো!"

প্রকাশ দারুণ চমকে উঠল। কোথায় যাওয়া হবে, তা একজন আর্মি অফিসার শুধু তার কানে-কানে বলেছে। কাকাবাবুর তো কোনো-ক্রমেই জানবার কথা নয়। উনি কি হিপ্‌নোটিজ্‌ম জানেন নাকি! তাও তো চোখ বুঁজে আছেন।

"আসাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে সন্তু একটু নিরাশই হল। সে আরও ভাবতে লাগলো, কাকাবাবু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কথা বললেন কেন? কে কাকে ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে?

প্লেনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, কখন সেটা নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে। একটু পরেই প্লেনটি একটি ঝাঁকুনি খেয়ে মাটি ছুঁল।

নামবার সময় এবারে আর কাকাবাবু কোনো কথা বললেন না। প্রকাশ খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে ফিরে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "স্যার, এত রাত্রে তো এখানে ডাব কোথাও নেই, কিছুতেই পেলুম না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে।"

এবারে জীপ নয়, একটা সাদা রঙের গাড়ি। প্রত্যেকবারই কাকাবাবুকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হচ্ছে। অথচ, কাকাবাবু কক্ষনো পরের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেন না। খোঁড়া পায়েই ক্রাচ বগলে নিয়ে উনি একা পাহাড়ে পর্যন্ত উঠতে পারেন। কিন্তু এখন হাতেও জোর নেই, ক্রাচও ধরতে পারছেন না।

গাড়ি এসে থামল আগরতলার সার্কিট হাউসে।

খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর কাকাবাবুর জন্য, অন্য ঘরটিতে প্রকাশ আর সন্তু থাকবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও তৈরিই ছিল। প্রকাশ বলল, "আজ অনেক ধকল গেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু এখন নিজে খেতেও পারেন না, তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। চামচে করে যে খাবার তুলবেন, হাতে সেই জোরটুকুও নেই। এই ক'দিন বাড়িতে ছোড়দিই খাইয়ে দিয়েছে কাকাবাবুকে। আজ সন্তু বসল কাকাবাবুকে খাওয়াতে।

কিন্তু তার তো অভ্যেস নেই, সে ঠিকঠাক পারবে কেন? ভাত তুলে কাকাবাবুর মুখে তুলে দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ বলল, "তুমি সরো, সন্তু, আমি দিচ্ছি। আমরা তো নার্সিং করতে জানি।"

কাকাবাবু দু' তিনবার ঠিকঠাক খেলেন। তারপর একবার কট্ করে চামচেটাকেই কামড়ে ধরে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলেন প্রকাশের হাত থেকে। তারপর সেই চামচটাকে চিবুতে লাগলেন কচর-মচর করে।

প্রকাশ আঁতকে উঠে বলল, "স্যার, স্যার, ও কী করছেন? ও কী?"

কাকাবাবু কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমায় স্যার স্যার বলছ কেন! আমার নাম রামনরেশ যাদব। আমি বিহারের একজন গোয়ালা। আমার একশো সাতান্নটা গোরু আছে। তুমি কি সেই একটা গোরু?"

সন্তুর বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগলো।

৫

প্রকাশ সরকার কাকাবাবুকে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সন্তুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বসল।

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে। সে যেন বুঝতে পারছে কাকাবাবুর একটা ভীষণ বিপদ আসছে। এই অবস্থায় বাড়ি থেকে এত দূরে থাকা কি ঠিক ?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার হল বলো তো, সন্তু ? উনি একবার বৈজনাথ বলে ডাকলেন আমাকে। তারপর নিজের নাম বললেন রামনরেশ যাদব। এরা কারা ?"

সন্তু বলল, "কোনোদিন আমি এই সব নাম শুনিনি !"

"তুমি তো ওঁর সঙ্গে সবকটা অভিযানেই গেছ, তাই না ? সুতরাং যে-সব ব্যাড ক্যারেকটারদের উনি দেখেছেন, তুমিও তাদের দেখেছ ?"

"তার কোনো মানে নেই। আমি তো মোটে চার-পাঁচ বার গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে। তার আগে কাকাবাবু আরও কত জায়গায় গেছেন। পা'টা ভেঙে যাবার আগে তো উনি আমাকে সঙ্গে নিতেন না।"

"আগেকার কথা বাদ দাও। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে তো তুমি ওঁর সঙ্গেই থেকেছ—"

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, "না, তাও ঠিক বলা যায় না। গত বছর আমার যখন পরীক্ষা ছিল, সেই সময় কাকাবাবু একাই যেন কোথায় গিয়েছিলেন…"

"কোথায় ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় যেন আসামের দিকেই।"

"কেন তোমার আসামের কথা মনে হল ? উনি কি তোমায় কিছু বলেছিলেন ?"

"না। তা বলেননি। তবে, উনি মা'র জন্য একটা বেশ সুন্দর নানা

রঙের কম্বলের মতন জিনিস এনেছিলেন, তার নাম খেস্। মা বলেছিলেন, ঐ জিনিস আসামেই ভাল পাওয়া যায়।"

"কিন্তু আসামে এসে বৈজনাথ কিংবা রামনরেশ যাদব টাইপের নামের ক্যারেকটারদের উনি মিট করবেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। বিহার, উত্তরপ্রদেশেই এই ধরনের নামের লোক থাকে।"

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু—"

"আমায় ডাক্তারবাবু বলার দরকার নেই। আমায় তুমি প্রকাশদা বলতে পারো।"

"আপনার কি মনে হয়, কাকাবাবুর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?"

"কিছু একটা গণ্ডগোল যে হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। উনি নিজেকেও অন্য মানুষ ভাবছেন। অবশ্য এটা খুব টেমপোরারিও হতে পারে। দেখা যাক, কাল সকালে কেমন থাকেন!"

"আপনি সত্যি করে বলুন, কাকাবাবু আবার ভাল হয়ে যাবেন তো?"

"নিশ্চয়ই! যে-কোনো ভাবেই হোক, ওঁকে ভাল করে তুলতেই হবে। ওঁর মাথাটাই তো একটা অ্যাসেট! তা হলে এবার শুয়ে পড়া যাক?"

পাশাপাশি দুটো খাটে ওদের বিছানা। মাঝখানে একটা টেব্‌ল ল্যাম্প। প্রকাশ সরকার সেই আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সন্তর ঘুম আসছে না। সে আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। কাকাবাবুর কথা মনে করলেই তার কান্না এসে যাচ্ছে। কাকাবাবু যদি পাগল হয়ে যান? না, না, তা হতেই পারে না! কাকাবাবুর মতন সাহসী মানুষ এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবেন?

যদি সত্যি-সত্যি কাকাবাবুর কিছু হয়, তা হলে সন্তু ছাড়বে না। যারা কাকাবাবুকে ঘুমের গুলি দিয়ে মেরেছে, তাদের সন্তু দেখে নেবে, যদি তারা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গিয়েও লুকোয়, তা হলেও সন্তু প্রতিশোধ নেবেই।

কিন্তু তারা কারা?

কাপুরুষের মতন তারা কাকাবাবুকে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে। কাকাবাবুকে তারা পুরোপুরি মেরে ফেলতেও চায়নি, শুধু তাঁর মাথাটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এটা তো মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

এই সব ভাবতে-ভাবতে কত রাত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। একটু বোধহয় তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠল সন্তু।

একটা গাড়ি ঢুকেছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। ইঞ্জিনের শব্দটা খুব জোর। কয়েকজন লোকের কথাও শোনা গেল এর পরে।

সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানলার পাশে।

সার্কিট হাউসের বারান্দার আলো সারা রাত জ্বালাই থাকে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা জোঙ্গা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে দু'তিন জন লোক নেমে কথা বলছে নাইট গার্ডের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। ঠিক যেন সন্তুর সঙ্গে কথা বলতেই আসছে। সোজা এসে তারপর লোকটি কিন্তু চলে গেল পাশের ঘরের দিকে।

সন্তুর তক্ষুনি মনে পড়ল কাকাবাবুর ঘরের দরজা খোলা আছে। কারণ, কাকাবাবু তো নিজে দরজা বন্ধ করতে পারবেন না, দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ লোকটা কাকাবাবুর ঘরের দিকেই গেল।

প্রকাশ সরকারকে ডাকবারও সময় পেল না সন্তু। সে অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। লোকটা নেই। কাকাবাবুর ঘরের একটা পাল্লা খোলা।

সন্তু সেই দরজার কাছে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল সন্তু। তার ধারণা হল, এইবার কেউ তাকে গুলি করবে।

কিন্তু সেরকম গুলি ছুটে এল না।

তার বদলে একজন কেউ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অনেকটা ভয় কেটে যায়। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি কে? আমাদের ঘরে ঢুকেছেন কেন?"

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেলল খাটের ওপর কাকাবাবুর মুখের ওপর।

ততক্ষণে সন্তু দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলেছে।

কালো রঙের প্যান্ট ও কালো ফুল শার্ট পরা একজন ঢ্যাঙা লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বড় টর্চ। সন্তু আগে কোনো লোককে এরকম টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

লোকটা বলল, "এই চার নম্বর ঘর আমাদের নামে বুক করা ছিল। নাইট গার্ড বলল, আমাদের রিজার্ভেশান ক্যানসেল্ড হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি, সত্যি এখানে একজন লোক শুয়ে আছে।"

প্রকাশ সরকারও এর মধ্যে উঠে এসেছে।

সে বলল, "আপনি কে? কিছু জিজ্ঞেস না-করে হুট করে এ-ঘরে ঢুকে এসেছেন কেন?"

লোকটি বলল, "কেন, তাতে কী হয়েছে? এ ঘর আমাদের নামে বুকিং…"

প্রকাশ বলল, "তা হতেই পারে না। একই ঘর কখনো দু' জনের নামে বুক হয়? আপনার বুকিং আছে কি না তা আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।"

লোকটি বলল, "আপনারা যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন আপনাদের এখন এখান থেকে তুলে দেব না নিশ্চয়ই। দেখি অন্য কী ব্যবস্থা করা যায়!"

সন্তু আর প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে লোকটা চলে গেল বাইরে।

প্রকাশ কাকাবাবুর কাছে এসে একটা চোখের পাতায় সামান্য আঙুল ছুঁয়ে বলল, উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কিছুই টের পান নি। তা হলেও…এত রাত্রে একটা লোক হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে…"

সন্তু বলল, "ওরা দেখে গেল।"

প্রকাশ বলল, "ওরা মানে ?"

সন্তু বলল, "যাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রথমে গৌহাটি যাওয়া হল, তারপর আগরতলায়—সেই তারাই এসে দেখে গেল কাকাবাবু এখানেই এসেছেন কি না !"

প্রকাশ হেসে বলল, "আরে না, না। ও লোকটা একটা উট্‌কো লোক। ওদের বুকিংয়ে বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। তাছাড়া, আমরা তো ঠিক কারোর চোখে ধুলো দিতে চাইনি, এমনিই সাবধানতার জন্য…"

"কিন্তু যে লোকটা এই ঘরে ঢুকেছিল, সেই লোকটা মোটেই ভাল না।"

"তুমি কী করে বুঝলে ?"

"ও কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরে ছিল। আমি কালো রঙের জামা পরা লোক আগে দেখিনি।"

"ওঃ হো ! এই জন্য। ঠিক কালো নয় তো, খুব গাঢ় খয়েরি। এক রঙের প্যান্ট-শার্ট পরা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে।"

"ঐ রকম চৌকো টর্চ …"

"গোল আর লম্বা টর্চ হাতে থাকলেই লোকটা ভাল হয়ে যেত ?"

"লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে।"

"তোমার দেখছি বড্ড বেশি বেশি সন্দেহ। শোনো, আমরা যে আজ আগরতলা এসেছি, তা বাইরের কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব।"

"কেন, আমরা কি এখানে মিথ্যে নাম লিখিয়েছি ? সার্কিট হাউসের লোকেরা তো জানে। যাই বলুন, ঐ লোকটার মুখ দেখে মনে হল, ও কাকাবাবুকে চিনতে পেরেছে।"

"যাঃ, কী যে বলো ! কাল সকালেই আমি খবর নেব ওরা কারা। এখন চলো, শুয়ে পড়া যাক।"

"আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এ-ঘরেই শোব। প্রথম থেকেই আমার তাই করা উচিত ছিল। আপনি বললেন বলে পাশের ঘরে চলে গেলুম।"

"বেশ তো, থাকো না।"

সন্তু চট করে পাশের ঘর থেকে জামা কাপড় নিয়ে এল। এ-ঘরেও দুটো খাট। কাকাবাবুর পাশের খাটে কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল। সেগুলো নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সন্তু।

এবারেও তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। তার বারবার মনে হচ্ছে, ঐ লম্বা লোকটা জোরালো টর্চ নিয়ে কাকাবাবুকে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু এসে পড়ায় কাকাবাবুর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

সার্কিট হাউসে জায়গা না পেয়ে ওদের জোঙ্গা জিপটা একটু আগেই চলে গেছে। তা যাক। ওরা যদি শত্রু পক্ষের লোক হয়, তা হলে একজনের চেহারা তো সন্তুর জানা রইল। কাকাবাবুর কোনো ক্ষতি হলে ঐ লোকটাকে সন্তু ঠিক খুঁজে বার করবেই।

পরদিন সন্তুর ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

সন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু জেগে উঠেছেন এর মধ্যেই। চোখ মেলে ঘরের ছাদ দেখছেন।

সন্তু কাছে গিয়ে বলল, "কাকাবাবু, চা খাবেন?"

কাকাবাবু কোনো উত্তর না দিয়ে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

সন্তু কাকাবাবুর মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে দিল। তারপর কাপে চা ঢেলে নিয়ে এল কাকাবাবুর মুখের সামনে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিলেন।

তারপর অদ্ভুত খসখসে গলায় বললেন, "এটা চা নয়। ষাঁড়ের রক্ত। এ জিনিস বাঘে খায়। মানুষে খায় না।"

সন্তু বলল, "চা-টা ভাল হয়নি বুঝি। আচ্ছা, আমি আবার অন্য চা দিতে বলছি।"

তখন ফিরে সন্তু সেই চায়ের কাপে নিজে একটা চুমুক দিয়ে দেখল। তার তো কিছু খারাপ লাগল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আজ কি ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ?"

সন্তু বলল, "না তো! এখন তো জুন মাস, আজ আট তারিখ।"

কাকাবাবু বললেন, "এলতলা বেলতলা, কে এল আগরতলা?"

সন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল "কী বললেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, হরিণ বলে কোথায় যাই!"

সন্তুর আবার ভয় করতে লাগল। কাকাবাবু ভুল বকতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি প্রকাশ সরকারকে ডাকা দরকার।

সে চলে গেল পাশের ঘরে। সে-ঘর ফাঁকা। প্রকাশ নেই। বাথরুমেও নেই। বাইরে উঁকি দিয়েও দেখা গেল না। সকালবেলা সে কোথায় চলে গেল?

অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রকাশ সরকারকে।

৬

সন্তু এখন ঠিক কী করবে, তা প্রথমে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

এখন সে কি প্রকাশ সরকারকে ভাল করে খুঁজে দেখতে যাবে? কিন্তু তা হলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? কাকাবাবুকে একা ফেলে রাখা যায় না।

প্রকাশ সরকার এত সকালে কোথায় গেল? সন্তুকে কিছু না বলে সে সার্কিট হাউসের বাইরে চলে যাবে, এটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই ওর কোনো বিপদ হয়েছে।

দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভাবতে লাগল।

এই জায়গাটায় কারুকেই সে চেনে না। এখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রকাশ সরকার। সে যদি আর না ফেরে, তা হলে তো সন্তু

মহা মুশকিলে পড়ে যাবে। কাকাবাবুর চিকিৎসার জন্য এক্ষুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কপালে হাত দিয়ে সন্তু নিজের ভুরু দুটো সোজা করল। ভুরু কুঁচকে থাকলে চলবে না। কেউ যেন বুঝতে না পারে সে ঘাবড়ে গেছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোক নজর রাখছে তার দিকে।

কিন্তু কারা শত্রুপক্ষ ?

প্রকাশ সরকার যদি সত্যিই আর না ফেরে, তা হলে এখানে সন্তু কতদিন থাকবে কাকাবাবুকে নিয়ে ? ফিরবেই বা কী করে ?

সন্তু একবার ভাবল, বাড়িতে বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে।

তারপরই ভাবল, এর আগে যতবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে, কোনোবারই সে বাড়িতে কোনো বিপদের কথা জানায়নি। মা-বাবা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এবারে তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী ?

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "ব্রজেশ্বর ! সাহেব সিং !"

সন্তু ভেতরে এসে বলল, "কী কাকাবাবু ? কাকে ডাকছেন ?"

কাকাবাবু গভীর মর্মভেদী দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে।

তারপর বললেন, "চেনা চেনা লাগছে ! তোমার নাম কী খোকা ? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে ?"

"কাকাবাবু ! আমি সন্তু !"

"সত্যি করে বলো তো, অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ মানে কী ? অশ্বত্থামা নামে সত্যিই কি কোনো হাতি ছিল ? কই, আগে তো কোনোদিন ঐ নাম শুনিনি !"

সন্তু এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে তা বুঝতে পারল না। তার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। কাকাবাবু তাকে চিনতে পারছেন না !

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "চুপ করে আছ কেন ? ঠিক

করে বলো, "কাচ্চু মিঞা কোথায় ?"

"কাচ্চু মিঞা কে ?"

"কাচ্চু মিঞা হল রাবণের ছোট ভাই। রাবণ ছিল লঙ্কার রাজা, আর কাচ্চু মিঞা গোলমরিচের ব্যবসা করে।"

"আমি কোনোদিন কাচ্চু মিঞার নাম শুনিনি।"

"কাচ্চু মিঞা জঙ্গলগড় থেকে পালিয়েছে। সে এখন লুকিয়ে আছে কোনো জায়গায়।"

"জঙ্গলগড় ? জঙ্গলগড় কোথায় ?"

কাকাবাবু শুক্‌নো গলায় হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ করে। তারপর বললেন, "অত সহজে কি জানা যায় ? তুমি কোন দলের স্পাই ?"

"কাকাবাবু, আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি সন্তু !"

"আমি সবাইকেই চিনি। আমি কুম্ভকর্ণকেও চিনি, আবার বেলগাছতলায় যে বসে থাকে, তাকেও চিনি।"

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই সন্তু চোখ তুলে তাকাল।

খাঁকি প্যাণ্ট-শার্ট পরা একজন লোক।

লোকটি বলল, "প্রকাশ সরকার কে আছে ?"

সন্তু বলল, "আমাদের সঙ্গে এসেছেন। এখন এখানে নেই। কেন ?"

লোকটি বলল, "এখানে নেই ? ঠিক আছে !"

সন্তু বলল, "কেন ? কে প্রকাশ সরকারকে খুঁজছে ?"

"টেলিফোন আছে।"

সন্তু যেন হাতে স্বর্গ পেল। টেলিফোনে প্রকাশ সরকারকে এখানে কে ডাকবে ? নিশ্চয়ই মিলিটারির লোক। কিংবা কলকাতার সেই মিঃ ভার্মা।

সন্তু বলল, "আমি টেলিফোন ধরছি। আপনি যান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

সন্তু দেখল কাকাবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

কাকাবাবুকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে রেখে যেতে চায় না সন্তু। কিন্তু টেলিফোনটাও ধরা দরকার।

টেবিলের ওপর তালা-চাবি পড়েছিল, সন্তু সেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর চাবিটা পকেটে ভরে সে দৌড় লাগাল অফিস-ঘরের দিকে।

ফোন তুলে সন্তু শুধু "হ্যালো" বলতেই একটি ভারী কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, "প্রকাশ সরকার? ইয়োর শেড নাম্বার প্লিজ।"

"সন্তু বলল, "প্রকাশ সরকার এখানে নেই, কোথায় যেন গেছে। আমি—"

কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

সন্তু পাগলের মতন হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করলেও আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

সন্তু দারুণ দমে গেল। আসল দরকারি কথাটাই বলা হল না। প্রকাশ সরকারকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানানো খুব দরকার ছিল। ওরা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করত।

হতাশভাবে সন্তু ফিরে এল আবার। চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি দারুণ রেগে গেছেন। কাকাবাবুকে ঘরে তালা বন্ধ করে যাওয়াটা উনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী?

সকাল থেকে কাকাবাবুর চা-ও খাওয়া হয়নি। সন্তুরও খিদে পেয়েছে।

সে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল বাজাল। বেয়ারা খাবার তো দিয়ে যাবে, কিন্তু তারপর পয়সা দেবে কে? কাকাবাবুর কাছে কি টাকা-কড়ি আছে? সে না-হয় দেখা যাবে এখন।

বেয়ারা আসতে সন্তু তাকে দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। আর বলে দিল, চা যেন খুব ভাল হয়। বাজে চা হলে ফেরত দেওয়া হবে।

কাকাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "কে ফোন করেছিল?"

সন্তু বলল, "জানি না! প্রকাশ সরকার নেই শুনেই লাইন কেটে

দিল। আমার কোনো কথা শুনলই না। কোড্ নাম্বার জিজ্ঞেস করছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “কালো কোট না সাদা কোট?”

“কোট না, কাকাবাবু, কোড নাম্বার।”

“নাম্বার, প্লাম্বার, স্লাম্বার, কিউকাম্বার.........”

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাকাবাবুর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনো আশাই নেই। প্রকাশ ডাক্তার যে এই সময় কোথায় গেল!

চুপ করে বসে রইল সন্তু। কাকাবাবু আপন মনে অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। সে-সব কোনো কথারই কোনো মানে নেই।

সন্তু ঠিক করে ফেলল, আজ বিকেলের মধ্যে যদি কোনো সাহায্য না আসে, তাহলে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতেই হবে।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল, সঙ্গে এল একজন বেশ সুন্দরী মহিলা। এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস।

মহিলাটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল “কেমন আছ, সন্তু? ওমা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ!”

মহিলাকে সন্তু চেনেই না। জীবনে কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না।

মহিলাটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, “কাকাবাবু কোথায়? ও, এই তো কাকাবাবু!”

ঝুঁকে পড়ে মহিলাটি কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিল। তারপর বলল, “আপনার শরীর এখন ভাল আছে নিশ্চয়ই?”

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মহিলাটিকে।

সে এবার সন্তুর দিকে ফিরে বলল, “আমায় তুমি চিনতে পারোনি মনে হচ্ছে? আমার নাম ডলি। আমি তোমার মাসতুতো বোন হই। তুমি তোমার বেলি মাসিকে চেনো তো? আমি তোমার সেই বেলি মাসির মেয়ে।”

সন্তু ডলি কিংবা বেলি মাসির নাম তো কোনোদিন শোনেনই নি, এমন কী, আগরতলায় তার যে কোনো মাসি থাকে তাও সে জানে না!

ডলি বলল, "আমরা আগে শিলচরে থাকতুম। এই তো গত মাসেই বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি জানলেন কী করে যে আমরা ··মানে কাকাবাবু এখানে এসেছেন?"

ডলি বলল, "বাঃ! জানাটা এমন কী শক্ত!. আমার ভাই এয়ার-পোর্টে কাজ করে। কাল রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে এসে সে বলল, কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখলুম এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন থেকে নামতে। কাকাবাবুর মতন লোক এখানে এলে সার্কিট হাউসেই উঠবেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। তারপর বলো, তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন? আর তোমার কুকুরটা?"

সন্তু ক্রমশই অবাক হচ্ছে। তার এই মাসতুতো দিদি তার কুকুরটার খবর পর্যন্ত রাখে, অথচ সে নিজে ওঁদের সম্পর্কে কিছুই জানে না? মা তো কোনোদিন এই বেলি মাসির কথা বলেননি।

ডলি বলল, "কাকাবাবু, আপনারা আগরতলায় এসে সার্কিট হাউসে থাকবেন, এর কোনো মানে হয় না। আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। আমাদের মস্ত বড় কোয়ার্টার··· মা বললেন, যা ডলি, যেমন করে পারিস কাকাবাবু আর সন্তুকে নিয়ে আয়।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু এখন নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না।"

ডলি বলল, "জানি, সে খবরও পেয়েছি। তুমি আর আমি ধরে-ধরে নিয়ে যাব। আমি একটা গাড়ি এনেছি সঙ্গে।"

সন্তু বলল, "আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া বারণ। এখানেই থাকতে হবে।"

ডলি বলল, "বারণ? কে বারণ করেছে?"

সন্তু বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন, তিনি এখন নেই। সেইজন্যই এখন অন্য কোথাও যাওয়া মুশকিল।"

ডলি বলল, "তাতে কী হয়েছে? এখানে আমাদের ঠিকানা রেখে যাব। তিনিও পরে যাবেন। নাও, খাবার ঠাণ্ডা করছ কেন, আগে খেয়ে নাও! কাকাবাবুকে খাইয়ে দিতে হবে তো? আমি দিচ্ছি।"

সন্তু দেখতে চাইল, ডলি নামের এই মেয়েটি খাইয়ে দেওয়ায় কাকাবাবু কোনো আপত্তি করবেন কি না।

কিন্তু কাকাবাবু একটুও আপত্তি করলেন না। লক্ষ্মীছেলের মতন সব খেয়ে নিতে লাগলেন।

খেতে-খেতে একবার মুখ তুলে ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলে উঠলেন, "মাসির বাড়ি দারুণ মজা কিল-চর নাই!"

৭

ডলি নামের মেয়েটি খুব যত্ন করে খাইয়ে দিল কাকাবাবুকে। তারপর মুখ ধুইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, "এবার চলুন, কাকাবাবু।"

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "সন্তু, তুমি সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও।"

সন্তু পড়েছে মহা মুশকিলে। সে বুঝতে পারছে যে, এখন এই সার্কিট হাউস ছেড়ে অচেনা কোনো মাসির বাড়িতে যাওয়া তাদের উচিত নয়। চারদিকে যেন বিপদের গন্ধ। সার্কিট হাউসে তবু অনেক লোকজন আছে, পাহারা দেবার ব্যবস্থা আছে। আর্মির লোকেরাও নিশ্চয়ই এখানে একবার খোঁজ-খবর নিতে আসবে। অথচ এই মহিলাটি এমন জোর করছে, যেন যেতেই হবে।

অবশ্য আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকাবাবু সন্তুর হাতে খেতে চান না। সন্তুর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। বোধহয় তিনি আর সন্তুকে চিনতেই পারছেন না। এই অবস্থায় কাকাবাবুর দেখাশুনো করা তো একা সন্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর একজন কারুর সাহায্য দরকার।

তবু সন্তু আমতা আমতা করে বলল, "এখন না গিয়ে বিকেলে গেলে হয় না?"

ডলি বলল, "কেন, বিকেলে কেন? এখন গাড়ি এনেছি, বিকেলে

গাড়ি পাব না। তা ছাড়া মা তোমাদের জন্য ইলিশ আর গল্‌দা চিংড়ি আনতে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু যোগীপুরুষদের মতন হাত দুটো ওপর দিকে তুলে বললেন, "এই যে! শিগ্‌গির!"

সন্তু ঐ ভঙ্গিটার মানে বোঝে। কাকাবাবু গেঞ্জি পরে আছেন, এখন তিনি জামা পরতে চান। তাঁকে জামা পরিয়ে দিতে হয়। হাত উঁচু করতেও কাকাবাবুর কষ্ট হয়। ঐ ভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

অর্থাৎ কাকাবাবু যেতে চাইছেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তু চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ল, সার্কিট হাউস ছেড়ে গেলে এখানকার বিল মেটাবে কে? সন্তুর কাছে মোটে দশ টাকা আছে। কাল রাত্তিরে প্রকাশ সরকার বলেছিল, কাকাবাবুর জন্য যা খরচপত্তর হবে, সব ভারত সরকার দিয়ে দেবে। কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা করবার ভার প্রকাশ সরকারের ওপর। সেই প্রকাশ সরকারই তো নেই।

ডলি বলল, "চলো, চলো, আর দেরি করছ কেন?"

সন্তু বলল, "আমাদের তো যাওয়া হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে আমাদের বিল মেটাবে কে?"

ডলি তক্ষুনি এ সমস্যার সমাধান করে দিল।

সে বলল, "তা হলে জিনিসপত্তর এখন নেবার দরকার নেই, সব এখানেই থাক। ঘরে তালা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। পরে আমার বাবা এসে টাকাপয়সা দিয়ে বিল মিটিয়ে সব জিনিসপত্তর নিয়ে যাবেন।"

আর আপত্তি করা যায় না, এবার যেতেই হবে।

সন্তু আর ডলি কাকাবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল, কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রাখলেন, সেইভাবে তিনজনে বার হল ঘর থেকে।

দরজায় তালা লাগাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল, কাকাবাবুর কাছে এমন কয়েকটা দরকারি জিনিস থাকে, যা তিনি কখনো হাতছাড়া করতে

চান না। তিনি যেখানেই যান, একটা কালো হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সঙ্গে থাকে। এবারে কাকাবাবু সেই ব্যাগটা নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। ব্যাগটা নিয়ে যাওয়া উচিত, না এখানেই রেখে গেলে ভাল হয়, তা সন্তু বুঝতে পারল না।

তবু সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কালো ব্যাগটা—"

কাকাবাবু বললেন, "কার ব্যাগ ? কিসের ব্যাগ ? কেন ব্যাগ ? আমি ব্যাগ-ট্যাগের কথা কিছু জানি না।"

সন্তু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

হাঁটা শুরু করার পর কাকাবাবু ডলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা লক্ষ্মী, তুমি আগে আমাকে কতবার দেখেছ ?"

ডলি বলল, "অনেকবার। এই তো শেষবার দেখা হল, বছর চারেক আগে, আমরা পুজোর সময় কলকাতায় গিয়েছিলুম, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হল⋯ আপনার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়, আপনি ব্যস্ত লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন মনে থাকবে না ? খুব মনে আছে। সেবার রাস্তায় খুব জল জমেছিল, তুমি জলে ভাসতে ভাসতে এসে থামলে আমাদের বাড়ির সামনে।"

ডলি একটু চমকে গিয়ে বলল, "জলে ভাসতে ভাসতে ? হ্যাঁ, রাস্তায় জল জমেছিল বটে, তবে হাঁটু পর্যন্ত। আমি তো জলে ভাসিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাসোনি ? বাঃ, বললেই হল ! তুমি একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে⋯"

কাকাবাবু ঐ একই কথা বলে যেতে লাগলেন বারবার।

সার্কিট হাউসের ঘরগুলোর সামনে দিয়ে একটা লম্বা টানা বারান্দা। সেই বারান্দার অন্য দিক দিয়ে দু'জন লম্বামতন লোক জুতোর শব্দ করে হেঁটে আসছে এদিকে।

ডলি বলল, "চলো, সন্তু, আমরা উঠোন দিয়ে নেমে যাই। আমাদের গাড়িটা ঐ দিকেই আছে।"

সন্তুর কেন যেন মনে হল, ঐ লোক দুটি তাদের খোঁজেই আসছে। শত্রু, না মিত্র? শত্রু হলেও এখন পালাবার কোনো উপায় নেই। সুতরাং দেখাই যাক না। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোক দুটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, "আপনিই তো মিঃ রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু যদি কিছু উল্টো-পাল্টা বলেন এই ভয়ে সন্তু আগে থেকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই।"

প্রথমজন বলল, "নমস্কার। আমার নাম শিশির দত্তগুপ্ত। আমি এখানকার ডি এস পি। আর ইনি অরিজিৎ দেববর্মন, এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। কাল রাত্তিরে আমরা দিল্লি থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি যে, আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।"

কাকাবাবু লোক দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না।

শিশির দত্তগুপ্তর মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, বেশ বড় একটা গোঁফ আছে, সেটাও কোঁকড়া মনে হয়। আর অরিজিৎ দেববর্মনের মাথার ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোট্ট গোলমতন টাক। তাঁর গোঁফ নেই।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "ডঃ প্রকাশ সরকার কোথায়? তাঁরও তো আপনাদের সঙ্গে থাকবার কথা। আপনারা কি বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন?"

সন্তু বলল, "প্রকাশ সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার মানে?"

সন্তু বলল, "সকালবেলায় উনি আমাদের কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন। এতক্ষণেও ফেরেননি!"

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! এ রকম তো হওয়া উচিত না। মিঃ রায়চৌধুরীকে ফেলে রেখে উনি চলে গেলেন? চলুন, ঘরে বসা যাক, পুরো ব্যাপারটা শুনি।"

ডলি কাকাবাবুর হাতটা নিজের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, "তা হলে আমি চলে যাই ?"

শিশির দত্তগুপ্ত একদৃষ্টিতে ডলিকে দেখছিলেন, এবার ভুরু কুঁচকে বললেন, "তোমার নাম চামেলি না ? তুমি এর মধ্যেই আবার কাজ শুরু করে দিয়েছ ? আপনারা একে চেনেন ? আগে দেখেছেন কখনো ?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "মানে, ঠিক চিনি না, তবে ইনি বললেন, ইনি আমার এক মাসির মেয়ে · মানে, মাসতুতো বোন, আমাদের যেতে বললেন ওঁর সঙ্গে···"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "মাসতুতো বোন ?" তারপরই হেসে উঠলেন হা—হা করে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু চামেলি ওরফে ডলির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "একবার ভাসলে, একবার ডুবলে !"

সঙ্গে-সঙ্গে চামেলি ওরফে ডলি কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

কাকাবাবুকে ছেড়ে শিশির দত্তগুপ্তর একটা হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "স্যার, আমায় বাঁচান। আপনি আমায় বাঁচান। ওরা আমায় মেরে ফেলবে।"

শিশির দত্তগুপ্ত বাঁকাভাবে বললেন, "আবার নাটক করছ ? তোমার অভিনয় আমি ঢের দেখেছি।"

চামেলি ওরফে ডলি বলল, "সত্যি বলছি, স্যার। আমি বাইরে বেরুলেই ওরা মেরে ফেলবে আমায়। আপনি আমাকে বাঁচান।"

"ওরা মানে কারা ?"

"তাদের চিনি না। কয়েকজন গুণ্ডামতন লোক, তারা বলেছে, যদি কাজ উদ্ধার করতে না পারি, তা হলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।"

"কাজ মানে, কী কাজ ?"

"কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনোরকমে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলেছিল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"কোথায় গাড়ি ? কী রঙের গাড়ি ? কত নম্বর ?"

"নম্বর জানি না। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর।"

শিশির দত্তগুপ্ত তক্ষুনি পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেলেন গেটের দিকে।

চামেলি ওরফে ডলির কান্নাকাটি শুনে আরও কয়েকজন লোক ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি-সত্যি চোখের জলে চামেলির গাল ভেসে যাচ্ছে।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "আপনাদের ঘর কোনটা ? চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক।"

সন্তু বলল, "আপনি একটু কাকাবাবুকে ধরুন, উনি নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না। আমি ঘরের তালা খুলছি।"

চামেলি তখনও ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছে। অরিজিৎ দেববর্মন কড়া গলায় বলল, "কান্না থামাও ! তুমি রায়চৌধুরীকে অন্যদিকে ধরো।"

ওরা কাকাবাবুকে ধরে ধরে ফিরিয়ে আনতে লাগল। সন্তু যখন চাবি দিয়ে তালা খুলছে, সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল চামেলি। সে কাকাবাবুকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল অরিজিৎ দেববর্মনের গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই পরে গেলেন মাটিতে।

সন্তু অবাক হয়ে পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখে চামেলিকে তাড়া করতে যাচ্ছিল, অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "থাক, ছেড়ে দাও। বোকা মেয়ে, এইভাবে কেউ পালাতে পারে ! ঠিক ধরা পড়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ইলিশ মাছে শর্ষে বাটা···ফসকে গেল, ফসকে গেল !"

৮

সন্তু ঘরের দরজা খুলে প্রথমে কাকাবাবুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর অরিজিৎ দেববর্মনকে বলল, "আপনি একটু এখানে থাকবেন, আমি একটু বাইরেটা দেখে আসব ?"

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "ব্যস্ত হবার কিছু নেই। শিশিরবাবু ঠিক চামেলিকে ধরে নিয়ে আসবেন।"

সন্তু তবু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বলল, "উনি আমাদের কাছে ওঁর নাম বলেছিলেন ডলি। বললেন যে, আমার মাসতুতো বোন, আমাদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "ওর যে কত নাম তার ঠিক নেই। ওর কাজই হল কলকাতা-আগরতলা প্লেনে উঠে অন্য যাত্রীদের হ্যাণ্ডব্যাগ চুরি করা। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে!"

সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সে আগে কখনো কোনো মেয়ে-চোর দেখেনি। ডলি ওরফে চামেলির কথাবার্তাগুলো যেন তার প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল, তা বলে ও যে চুরি করে, তা সে ধারণাই করতে পারেনি।

অরিজিৎবাবুর কথাই ঠিক হল। চামেলি ধরা পড়ে গেছে। সন্তু দেখল, শিশির দত্তগুপ্ত তার এক হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে আসছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে আসছে এক দঙ্গল লোক।

শিশিরবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার পরেও লোকগুলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। শিশিরবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "এই যে, ভাই, আপনারা সব যান তো! এখানে ভিড় করবেন না!"

সন্তু গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চামেলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নকল কান্না নয়, জলের ধারা গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

শিশরবাবু কড়া গলায় বললেন, "কান্না থামাও! হঠাৎ এরকম নাটক শুরু করে দিলে কেন? এখানে এসেছিলে কী মতলবে?"

কাঁদতে-কাঁদতে চামেলি বলল, "ওরা পাঠিয়েছিল। ওরা বলেছিল, এ কাজ ঠিকঠিক না করতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।"

"ওরা মানে কারা? তাদের নাম বলো।*

"নাম আমি জানি না। তাদের ভয়ংকর চেহারা, দেখলেই মনে হয় মানুষ খুন করতে পারে। তারা বলল, কাকাবাবুকে যে-কোনো উপায়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়িতে নিয়ে এসো। নইলে তুমি প্রাণে বাঁচবে না!"

অরিজিৎবাবু বললেন, "ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। প্রায় তো নিয়েই যাচ্ছিল মেয়েটা!"

শিশিরববাবু বললেন, "না, না, এ মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। আমি বাইরে গিয়ে কোনো কালো অ্যামবাসাডর দেখতে পাইনি। কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে খবর পাওয়ার পর আজ ভোর থেকেই আমি সার্কিট হাউসের বাইরে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তারা বলল, অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে ওরকম কোনো কালো গাড়ি এখানে আসেনি। চামেলিকে তারা ঢুকতে দেখেছে, চামেলি এসেছে সাইকেল রিকশা করে।"

চামেলি তবু হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "না, স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথা বলছি। কালো গাড়িটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, একেবারে কাছে আসতে চায়নি।"

শিশিরবাবু বললেন, "কতটা দূরে গাড়িটা রেখেছিল?"

"প্রায় আধমাইল।"

"এতদূরে তুমি মিঃ রায়চৌধুরীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে?"

"না, না, সাইকেল রিকশায়।"

শিশিরবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমায় কী বলেছিল? সার্কিট হাউসের বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, না?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "হ্যাঁ...মানে, সেইরকমই বলেছিলেন।"

কাকাবাবু ঘরে ঢোকার পর থেকেই চোখ বুজে আছেন। যেন তিনি কিছুই শুনছেন না; এ-সব ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহই নেই।

চামেলি আবার বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই। ওরা আমায় ভয় দেখিয়ে সব করিয়েছে।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "কাজ হাঁসিল তো তুমি করতে পারোনি। তবু তুমি পালাবার চেষ্টা করলে কেন? তোমার সেই "ওরা" না হয় তোমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল, তা বলে আমরা কি তোমায় খুন করতুম?"

"কী জানি, স্যার, আপনাদের দেখেই আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল।"

তারপর সে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি···ছি ছি ছি ছি, আমি কী অন্যায় করেছি! আমার মাথার ঠিক ছিল না···বলুন, কাকাবাবু, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন বলুন!"

সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা বলেই কেউ তাঁর পায়ে হাত দিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কী কারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেন না। নিশ্চয়ই কাকাবাবু এবার খুব রেগে উঠবেন।

কিন্তু কাকাবাবু চোখ মেলে খুব শান্তভাবে বললেন, "একে ছেড়ে দিন! এই মেয়েটি এখানে রয়েছে কেন?"

অরিজিৎবাবু ও শিশিরবাবু দু'জনেই চমকে উঠলেন।

শিশিরবাবু বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি একে ছেড়ে দিতে বলছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে, মেয়েটি এখন বাড়ি যাক্।"

শিশিরবাবু বললেন, "এই মেয়েটি দাগি আসামি। ওকে জেরা করলে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, কারা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, সে সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া আছে? আগরতলায় আপনার কোনো শত্রু আছে?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার? হায়, হায়, হায়, হায়! সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়! হায়, হায়, হায়, হায়!"

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। শিশিরবাবুর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল। অরিজিৎবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস। দিল্লি থেকে যা খবর এসেছে···"

কাকাবাবু বললেন, "রামনরেশ ইয়াদব কভি নেই দিল্লি গিয়া!"

সন্তু ফিসফিস করে শিশিরবাবুকে বলল, "শুনুন, আমার কাকাবাবুর মাথায় কীরকম যেন গোলমাল হয়ে গেছে। ওঁর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।"

শিশিরবাবু বললেন, "ইজ দ্যাট সো?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, "এই খোকা, বড়দের সামনে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলতে নেই, জানো না? ব্যাড ম্যানার্স! যাও, তোমার দিদির সঙ্গে বাড়ি চলে যাও।"

সন্তুর যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে! কাকাবাবু তাকে আর একদম চিনতে পারছেন না।

এমন কী, চামেলি পর্যন্ত কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

অরিজিৎবাবু বললেন, "তা হলে তো এঁর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ডক্টর প্রকাশ সরকারই বা কোথায় গেলেন?"

শিশিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি চামেলিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে ওকে আপাতত আটকে রাখুক। মিঃ রায়চৌধুরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি এখানে সুবিধে হবে, না হাসপাতালে পাঠাবেন?"

অরিজিৎবাবু বললেন, "এখানে নানা লোকের ভিড়। মহারাজার গেস্ট হাউস খালি আছে, আমি ভাবছিলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে সেখানে রাখলে কেমন হয়। সেখানে চিকিৎসার কোনো অসুবিধে হবে না। একজন নার্স রেখে দিলেই হবে।"

চামেলি বলে উঠল, "আমায় নার্স রাখুন। আমি নার্সিং খুব ভাল জানি। আমি কাকাবাবুর সেবা করব!"

অরিজিৎবাবু বললেন, "এ মেয়ের আবদার তো কম নয়। একটু আগে এই মেয়েটা ভদ্রলোককে ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, এখন আবার বলে কি না সেবা করব!"

চামেলি বলল, "একবার ভুল করেছি বলে বুঝি ক্ষমা করা যায় না?" আমি কাছাকাছি থাকলে ওরা আর কাকাবাবুকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শিশিরবাবু বললেন, "এবার সত্যি করে বলো তো, ওরা মানে কারা?"

"আপনি আমায় ঠিক বাঁচিয়ে দেবেন বলুন? আমি ওদের মধ্যে একজনকে চিনি। সে হচ্ছে জগদীপ!"

"জগদীপ!"

"হ্যাঁ, জগদীপই তো একটা রিভলভার আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল···"

"ওঃ, এই মেয়েটা কী অসহ্য মিথ্যেবাদী! জগদীপ গত ছ'মাস ধরে জেল খাটছে, আর সে কিনা ওর কপালের সামনে রিভলভার তুলতে এসেছে?"

'হ্যাঁ, স্যার, সত্যি বলছি, জগদীপই আমায় ভয় দেখিয়েছে। জগদীপ জেল থেকে পালিয়ে গেছে, জানেন না?"

"একদম বাজে কথা!"

ঠিক তখনই ঠকঠক করে শব্দ হল দরজায়।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখল, একজন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ লোক, সাদা ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটি পুলিশ। কেন যে এদের সাদা পোশাকের পুলিশ বলে, তা কে জানে। একবার তাকালেই তো পুলিশ বলে চেনা যায়।

লোকটি প্রথমে শিশিরবাবুর দিকে তাকিয়ে লম্বা স্যালুট দিল। তারপর অরিজিৎবাবুকে।

শিশিরবাবু ওকে দেখেই বললেন, "এই তো ভজনলাল! তুমি

বলো তো, জগদীপ এখন কোথায়? সে জেলে আছে না?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার!"

"সে কি জেল ভেঙে পালিয়েছে এর মধ্যে?"

"না স্যার!"

শিশিরবাবু অন্যদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "দেখলেন, মেয়েটা কী রকম মিথ্যে কথা বলে?"

চামেলি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, "তা হলে বোধহয় জয়দীপ নয়। তা হলে বোধহয় ওর নাম রাজাধিপ।"

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু দু'জনেই দারুণ চমকে উঠলেন এই নামটা শুনে।

অরিজিৎবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "প্রিপস্টারাস! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে।"

শিশিরবাবু বললেন, "একে আবার জেলে না দিয়ে উপায় নেই।"

বাইরের সাদা পোশাকের পুলিশটি এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "স্যার!"

শিশিরবাবু বললেন, "ও! কী ব্যাপার, ভজনলাল?"

সেই লোকটি বলল, "স্যার, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশা একজন লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটা অজ্ঞান!"

শিশিরবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুও ছুটল গেটের দিকে।

৯

সন্তুর ধারণা হল বাইরে গিয়ে সে ডক্টর প্রকাশ সরকারকে দেখতে পাবে। কারণ ভোর থেকে প্রকাশ সরকারের উধাও হয়ে যাবার সে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু বাইরে এসে দেখল, একটা সাইকেল-রিক্শার ওপর একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক গা এলিয়ে শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। লোকটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ের

চটিও বেশ দামি। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে এই পোশাক যেন একেবারেই বেমানান। লোকটির গায়ের রং পোড়া-পোড়া, মুখে পাঁচ-ছ' দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো।

শিশির দত্তগুপ্ত আর অরিজিৎ দেববর্মনও লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

সাইকেল-রিক্‌শা-চালকটি হতভম্ব মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশিরবাবু প্রথমে শুয়ে-থাকা লোকটির হাত ও বুক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে বেঁচে আছে কি না। তারপর রিকশাচালককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, একে কোথায় পেলে?"

রিকশাচালক বলল, "বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ফিসারি অফিসের ধার থেকে ছুটি বাবু কাঁধ ধরাধরি করে উঠলেন। আমারে হেঁকে বললেন, সার্কিট হাউস চলো! খানিকবাদে আমি একবার পিছু ফিরে দেখি এক বাবু নেই। আর-এক বাবু এরকমধারা এলিয়ে পড়ে আছেন।"

"একজন মাঝপথ থেকে নেমে গেল, তুমি টেরও পেলে না?"

"না, বাবু! আমি তো আগে আর পেছুন ফিরে তাকাইনি!"

"কিন্তু গাড়ি তো হালকা হয়ে গেল। তা ছাড়া একজন লোক নেমে গেলে গাড়িতে একটা ঝাঁকুনিও তো লাগবে?"

"মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তা খারাপ ছিল, সেখানে এমনিতেই তো গাড়ি লাফাচ্ছিল!"

"যে-লোকটি নেমে গেছে, তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?'

"জামা আর প্যান্টুলুন পরা এমনি সাধারণ ভদ্দরলোকের মতন!"

"আর এই লোকটি কি তখন নিজে থেকেই তোমার রিকশায় উঠেছিল?"

"অন্য বাবুটির কাঁধ ধরাধরি করে এল। আমি ভাবলুম বুঝি শরীর খারাপ।"

সন্তু বলল, "চামেলি এই লোকটিকে চেনে কিনা একবার দেখলে হয়।"

শিশিরবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে, এই লোকটির সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর কেসের কোনো সম্বন্ধই নেই। এ হয়তো সার্কিট হাউসের অন্য ঘরে থাকে। যাই হোক, দেখা যাক।"

ধরাধরি করে লোকটিকে নিয়ে আসা হল সার্কিট হাউসের অফিস-ঘরে। ম্যানেজার কিংবা দরোয়ানরা কেউ-ই লোকটিকে চেনে না।

সন্তু গিয়ে চামেলিকে ডেকে আনল। অরিজিৎবাবু রইলেন কাকাবাবুর কাছে।

চামেলি লোকটিকে দেখে বলল, "ও মা, এ আবার কে? একে তো কখনো দেখিনি।"

শিশিরবাবু সার্কিট হাউসের ম্যানেজারকে বললেন, লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। একজন পুলিশ সেখানে রেখে দিলেন লোকটিকে পাহারা দেবার জন্য।

কাকাবাবুর ঘরে ফিরে এসে সন্তু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলল। তাদেরও সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। শিশিরবাবু এখানকার মহারাজার একটি গেস্ট হাউসে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

চামেলি এই সময় বলল, "স্যার, আমি তা হলে এবারে যাই?"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তুমি যাবে? কোথায় যাবে?"

"বাড়ি যাব। আমি আর এখন এখানে থেকে কী করব?"

"তোমার আবার আগরতলায় বাড়ি আছে নাকি? আমি তো যতদূর জানি তোমার বাড়ি ধর্মনগরে।"

"না, মানে, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে।"

"তোমার বন্ধু কে, তার নামটা তো জানতে হচ্ছে। সে-ও নিশ্চয় তোমারই মতন।"

শিশিরবাবু বললেন, "একটু আগে তুমি বললে, তুমি কাজ হাসিল না করতে পারলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। তারপর একটু বাদে বললে, তুমি আগের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাকাবাবুর সেবা করবে। আবার এখন বলছ বন্ধুর বাড়ি যাবে। তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাদের!"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তোমায় আর ছাড়া হবে না। জেলখানাই তোমার পক্ষে ভাল জায়গা।"

চামেলি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে, এই ভাবে বলল, "না, না, আমায় আর জেলে পাঠাবেন না। আমার জেলের মধ্যে থাকতে একদম ভাল লাগে না!"

কাকাবাবু আগাগোড়া চুপ করে চোখ বুঁজে বসে আছেন। এসব কথা শুনছেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু এবার বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, উঠুন, এখন আমাদের যেতে হবে।"

সন্তু বলল, "ওঁকে ধরে-ধরে তুলতে হবে। উনি নিজে হাঁটতে পারেন না।"

শিশিরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! চলো, তুমি আর আমি ওঁকে ধরে নিয়ে যাই।"

কাকাবাবু এবারেও কোনো কথা বললেন না, ওদের বাধাও দিলেন না।

সার্কিট হাউস ছেড়ে বাইরে যাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল ডাক্তার প্রকাশ সরকারের কথা। ভদ্রলোক কোথায় যে গেলেন? এর পর তিনি ফিরে এলেও সন্তুদের খুঁজে পাবেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু একটা স্টেশান ওয়াগন আনিয়েছিলেন। সেটার পেছন দিকে শুয়ে দেওয়া হল কাকাবাবুকে। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিল।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকগুলো বাড়ি। তার মধ্যেই কয়েকটি বাড়িকে অতিথিশালা করা হয়েছে। সন্তুরা যে-বাড়িটাতে এসে পৌঁছোল, সেটা দেখলে রাজার বাড়ি মনে হয় না। বাড়িটা এমনিতে বেশ সুন্দর, ছোট্টখাট্টো, দোতলা। সাদা রঙের। সামনে অনেকখানি বাগান। মনে হয় কোনো সাহেবের বাড়ি। হয়তো এক সময় কোনো সাহেবেরই ছিল।

সবাই মিলে উঠে এল ওপরে। দোতলায় মাত্র তিনখানা ঘর

আর বেশ চওড়া বারান্দা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘরটা সন্তুদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

অরিজিৎবাবু বললেন, "নীচে রান্নার লোক আছে, কেয়ারটেকার আছে, যখন যা চাইবে দেবে। তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সারাক্ষণ থাকবে। আর একজন ডাক্তারও এসে দেখে যাবেন একটু বাদে।"

শিশিরবাবু বললেন, "একতলার ঘরে দুজন পুলিশও থাকবে। অচেনা কোনো লোককে ওরা ওপরে আসতে দেবে না। তোমরাও কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা কোরো না। তোমার কাকাবাবুর এখন একদম চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকা উচিত।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এখানে টেলিফোন আছে? হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে খবর দেব কী করে?

শিশিরবাবু বললেন, "হ্যাঁ। একতলায় টেলিফোন আছে। তা-ছাড়া কোনো দরকার হলে আমার পুলিশদের বোলো, ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "আমায় এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে। দিল্লিতে সব খবর জানানো দরকার। সন্তু, কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে কোনো খবর পাঠাতে হবে?"

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, "না, থাক।"

শিশিরবাবুরও কাজ আছে, তাঁকেও এখন যেতে হবে। দুজনেই 'আবার বিকেলে আসব', বলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকাবাবুকে। অনেকক্ষণ থেকে তিনি একেবারে চুপ করে আছেন। শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু এর মধ্যে কাকাবাবুর সঙ্গে দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কাকাবাবু কোনো উত্তর দেননি। এখনো তিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

কাকাবাবুর বেশ কয়েক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যেস সকালবেলা। আজ উনি মোটে এক কাপ চা খেয়েছেন। বেলা এখন প্রায়

এগারোটা। সেইজন্য সন্তু কাকাবাবুর কাছে গিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কফি খাবেন? আমাদের সঙ্গে কফি আছে, নীচের লোকদের বানিয়ে দিতে বলতে পারি।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালেন সন্তুর দিকে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "তুমি···তুই সন্তু না?"

সন্তু ব্যগ্রভাবে বলল, "হ্যাঁ, কাকাবাবু!"

"একবার মনে হচ্ছে সন্তু, আর একবার মনে হচ্ছে সিংমা। আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না রে। মাথার মধ্যে সব যেন কী-রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

এ-কথা শুনেও সন্তু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাল রাত্তির থেকে সে কাকাবাবুর মুখে এত স্বাভাবিক কথা আর শোনেনি।

সে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নিন, তা হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমরা কোথায় এসেছি রে? এই জায়গাটা কোথায়?"

"এটা ত্রিপুরার আগরতলা।"

"আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই নিয়ে এল!"

"কেন কাকাবাবু? এখানে আপনার অসুবিধে হবে?"

"কী জানি! আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!"

কাকাবাবু আবার চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু আর কফি খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সন্তু একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর ঘুরে দেখতে গেল সারা বাড়িটা।

অন্য দু খানা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে তালা বন্ধ, অন্য ঘরটি খোলা। সেটার দরজা ঠেলে সন্তু দেখল, ঘরটি বেশ বড়, এক পাশে একটা খাওয়ার টেবিল আর অন্য পাশে কয়েকটা সোফা-কৌচ সাজানো। একটা বেশ বড় রেডিও রয়েছে সেখানে। সে-ঘরের দু' দিকের দেওয়ালে দুটো ছবি। একটা ত্রিপুরার আগেকার কোনো মহারাজার,

আর একটা রবীন্দ্রনাথের।

তিনতলার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠে সন্তু দেখল ছাদের দরজার তালাবন্ধ। সন্তু একটু নিরাশ হয়েই নেমে এল। যে-কোনো নতুন বাড়িতে গেলেই তার ছাদটা দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্তু নেমে গেল একতলায়।

সিড়িঁর পাশের ঘরটার সামনেই টুল পেতে দুজন সাদা-পোশাকের ষণ্ডামার্কা পুলিশ বসে আছে। সন্তুকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কী, কিছু লাগবে?"

সন্তু বলল, "না, বাগানটা একটু দেখতে এসেছি।"

বাগানটি বেশ যত্ন করে সাজানো। নিশ্চয়ই মালি আছে। গোলাপ আর জুঁই ফুলই বেশি। সন্তু কক্ষনো ফুল ছেঁড়ে না, ফুল গাছে থাকলেই তার দেখতে ভাল লাগে। সে মুখ নিচু করে এক-একটা ফুলের গন্ধ নিতে লাগল।

বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্তু অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। সকাল থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেল!

একটা ব্যাপার সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাদের থাকবার কথা ছিল পুরী। তারপর হঠাৎ সেই প্ল্যান বদল করে তাকে আর কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে। সেখান থেকে আবার তাদের আনা হল এই আগরতলায়। এক রাত্তিরের মধ্যে এসব ঘটেছে। তবু আগরতলায় এত লোক তাদের কথা জানল কী করে? আর এখানে তাদের এত শত্রুই বা হল কেন?

সন্তু এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। কী-রকম যেন স্প্রে করার মতন ফিঁস্‌স ফিঁস্‌স শব্দ। সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল একটা সাপ ফণা তুলে আছে তার দিকে।

১০

সন্তু তো আর সাধারণ শহরের ছেলেদের মতন নয় যে, সাপ দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠবে! সে কত দুর্গম পাহাড় আর কত গভীর জঙ্গলে গেছে, সাপ-টাপ দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে আর একটু হলেই সে সাপটাকে মাড়িয়ে দিত। তা হলেই হয়েছিল আর কী!

সেবার আন্দামানে যাবার পথে কাকাবাবু সন্তুকে সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সন্তু জানে, যে সাপ ফণা তুলতে পারে, সে সাপের বিষ থাকে। তা হলেও বিষাক্ত সাপ চট করে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ তো আর সাপের খাদ্য নয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যায়।

কিন্তু এই সাপটা তো যাচ্ছে না। সন্তুর দিকেই ফণাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু একটু দুলছে। চিড়িক চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে তার লম্বা জিভটা। এবারে সন্তুর গায়ে ঘাম দেখা গেল।

সাপটার দিকে চোখ রেখে সন্তু খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে লাগল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেই ছুঁড়ে মারল সাপটার গায়ে। সাপটা অমনি পাঞ্জাবিটার মধ্যে পাক খেতে-খেতে ছোবল মারতে লাগল বারবার।

সন্তু এই সুযোগে সরে গেল অনেকটা দূরে। এই কায়দাটাও কাকাবাবুর কাছ থেকে শেখা। ছোটখাটো লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে সাপ মারার চেষ্টা না করে গায়ের জামা ছুঁড়ে মারলে অনেক বেশি কাজ হয়। সাপটার যত রাগ পড়েছে ঐ পাঞ্জাবিটার ওপরে, ওটার মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে বাবাবার।

সন্তুর ভাবভঙ্গি দেখে বারান্দায় বসে-থাকা পুলিশ দু'জনের কী যেন

সন্দেহ হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, খোকাবাবু?"

এই খোকাবাবু ডাকটা শুনলে সন্তুর গা জ্বলে যায়। আর ক'দিন বাদে সে কলেজে পড়তে যাবে! এখনো সে খোকাবাবু!

যেন কিছুই না, একটা আরশোলা বা গুবরে পোকা, এইরকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সন্তু বলল "কুছ নেহি, একঠো সাপ হ্যায়!"

ত্রিপুরায় সবাই বাংলায় কথা বলে, তবু সন্তু হিন্দিতে কেন জবাব দিল কে জানে! বোধহয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনিই হিন্দি এসে যায়!

"সাপ!" একজন পুলিশ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বাগানের মধ্যে নেমে এসে বলল, "কোথায়?"

সন্তু আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবিটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ যে!"

এবারে পুলিশটি চমকে উঠে বলল, "বাপ রে! সত্যিই তো সাপ! লাঠি, লাঠি কোথায়। এই শিবু, লাঠি আনো!"

তখন অনেকে দৌড়ে এল।

সাপেরা এমনিতে কানে কিছুই শুনতে পায় না। কিন্তু লোকজন চলার সময় মাটিতে আর হাওয়ায় যে তরঙ্গ হয়, সেটা ঠিক শরীর দিয়ে টের পায়। এক সঙ্গে অনেক লোকের পায়ের ধুপধাপে সাপটা বুঝে গেল যে বিপদ আসছে। এবারে সে পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল পাশের একটা ঝোপে।

পুলিশ দু'জন আর রান্নার লোকটি সেই ঝোপটায় লাঠিপেটা করতে লাগল। সেই লাঠির চোটে আহত হল কয়েকটা ফুলগাছ, সাপের গায়ে লাগল না। সন্তু দেখতে পেয়েছে সাপটা একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে। সাপেরা কিন্তু বেশ বোকা হয়। গর্তের মধ্যে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় মুখটা, লেজের দিকটা অনেকক্ষণ বাইরে থাকে। যে-কেউ তো লেজটা ধরে টেনে তুলতে পারে।

পুলিশরা ফুলের ঝোপে তখনও লাঠি পিটিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হৈ-হৈ করে ছুটে এল বাগানের মালি। সাপের ব্যাপারটায় সে কোনো

গুরুত্বই দিল না, ফুলগাছ নষ্ট হচ্ছে বলে সে খুব রাগারাগি করতে লাগল। ওটা নাকি বাস্তুসাপ, কারুকে কামড়ায় না।

সন্তু অবশ্য বাস্তুসাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। গায়ে পা পড়লেও সাপটা কামড়াত না? তা কখনো হয়! তাহলে তার জামার ওপর অত ছোবল মারল কেন? আর তার বাগানে আসার শখ নেই।

মালি সন্তুর পাঞ্জাবিটা মাটি থেকে তুলতে যেতেই সন্তু বলল, "ছোঁবেন না, ওটা ছোঁবেন না, ওতে সাপের বিষ আছে।"

মালি কিন্তু বিষের কথা শুনেও ঘাবড়াল না। বলল, "আপনার জামা? ও কিছু হবে না, একটু ধুয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তু অবশ্য আগেই ঠিক করে ফেলেছে যে, ও জামা সে আর গায়ে দেবে না। সাপের বিষ মাখা জামা কেউ গায় দেয়? সে ওটা আর ছুঁয়েই দেখবে না।

মালি জামাটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই সন্তু বলল, "ওটা আমার চাই না।"

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল ওপরে। এতবড় একটা খবর কাকাবাবুকে না জানালে চলে!

কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তার উৎসাহ চুপসে গেল। কাকাবাবুর যেন এ-ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, সাপ! এই অ্যাত্ত বড়!"

ইচ্ছে করেই সন্তু সাপের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেখাল, কিন্তু কাকাবাবু শুকনো মুখে তাকিয়ে রইলেন। সন্তু আবার বলল, "ঠিক আমার পায়ের কাছে, আর একটু হলেই কামড়ে দিত!"

কাকাবাবু তবু কোনো কথা বললেন না। যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। মনে হল, কোনো কারণে কাকাবাবুর খুব মন খারাপ।

সন্তুরও মন খারাপ হয়ে গেল। সাপটা যদি তাকে কামড়ে দিত। তা হলে কী হত? সন্তু মরেও যেতে পারত। সাপে কামড়ালেই অবশ্য সব সময় মানুষ মরে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেরে যায়। কিন্তু হাসপাতাল-টাসপাতাল সন্তুর খুব বিচ্ছিরি

লাগে। সে মরে গেলে কিংবা হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কাকাবাবুর দেখাশুনো করত কে? কাকাবাবুর মাথার একেবারে ঠিক নেই!

সন্তু বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দেখল রিকশা করে একজন মহিলা এসে নামলো গেটের কাছে। একটু বাদেই একজন পুলিশ সেই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওপরে।

সেই মহিলা একজন নার্স। দেববর্মনবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা মহিলার, কাজে বেশ পটু মনে হয়। সন্তু তাকে কাকাবাবুর অসুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিল। কাকাবাবুও বেশ শান্তভাবে মেনে নিলেন এই নার্সের ব্যবস্থা। সন্তু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে সন্তুর মনে হল, এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কাকাবাবুকে নিয়ে এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল। কাকাবাবু যদি নিজেই কোনো নির্দেশ না দেন, কখন কী করতে হবে বলে না দেন, তা হলে আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। এবং কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো দরকার। বিকেলবেলা গভর্নমেন্টের লোকেরা এলেই সন্তু এই কথা বলবে।

বিকেলবেলা ওঁরা আসবার আগেই আর একজন এলেন, যাঁকে দেখে সন্তু খুব খুশি হয়ে উঠলো। এর নাম নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লির খুব বড় অফিসার, কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। নরেন্দ্র ভার্মা এসে গেছেন, আর সন্তুর কোনো চিন্তা নেই।

ভার্মাকে জিপ থেকে নামতে দেখেই সন্তু ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নীচে নেমে গেল। ভার্মা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন বলে বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন।

সন্তুকে দেখে ভার্মা বললেন, "আরে আরে সন্টুবাবু, কেমন আছ? সব ভাল তো?"

ভার্মা সন্তুকে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ভার্মা খুবই লম্বা মানুষ, নস্যি-রঙের সাফারি স্যুট পরে আছেন, তাঁর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ।

সন্তু অভিমান ভরা গলায় বলল, "না নরেনকাকা, এবারে কিছুই ভাল না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমি দুপুরে এসে পৌঁছেই সার্কিট হাউসে গেলাম তোমাদের ঢুঁড়তে। তোমাদের না পেয়ে ফোন করলাম দেববর্মনকে। তার কাছে শুনলাম কি এর মধ্যেই রায়চৌধুরীকে স্ন্যাচ্ করার অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেছে। বড় তাজ্জব কথা। আগরতলায় আমিই তোমাদের পাঠাতে বলেছি, এখানকার কোনো লোকের তো জানবার কথা নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এত জায়গা থাকতে আমাদের এই আগরতলাতেই পাঠালেন কেন?"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মা বললেন, "ত্রিপুরার কথা তোমার কাকাবাবু খুব বলাবলি করছিলেন এখন। মানে ত্রিপুরাতে উনি কী যেন একটা ধান্দা করেছিলেন। তাই আমরা ভাবলাম কী, উনি ত্রিপুরাতে হাজির হয়ে শরীরটা সারিয়ে নিন্ আর এখানে কিছু খোঁজখবরও নিন। একটা গুড্ নিউজ দিই সন্টুবাবু তোমাকে, যে বদমাসটা তোমার কাকাবাবুকে গুলি করেছিল, সে ধরা পড়ে গেছে।"

"ধরা পড়েছে? সে কী বলল? কেন গুলি করেছিল?"

"লোকটা গুংগা··· মানে কী যেন বলে, হ্যাঁ, বোবা!"

"বোবা? যাঃ!"

"তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ওকে কে পাঠিয়েছিল সে কানেকশান আমরা ঠিক বার করে নিব।"

"নরেনকাকা, এখানে কাকাবাবুর কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এখন আমাদের কলকাতায় ফিরে গেলে ভাল হয় না?"

"কলকাতার জন্য মন ছটফট করছে? কেন, ঘুড়ি উড়াবার সিজ্ন বুঝি? আচ্ছা রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখি!"

কাকাবাবু পিঠের নীচে দুটো বালিশ দিয়ে আধ-বসা হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই যে রাজা, কেমুন

আছ ? তবিয়ৎ তো বেশ ভালই দেখছি।"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "এ আবার কে ? এই লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা লোকটা কোথা থেকে এল ?"

ভার্মা যেন বুকে একটা ঘুঁষি খেয়ে থমকে গেলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "রাজা, আমি নরেন্দ্র, আমায় চিনতে পারছ না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নরঃ নরৌ নরাঃ আর ফলম্ ফলে ফলানি ! আর একটা আছে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, গানের আমি কী জানি ! আসলে কিন্তু আমি সব জানি ! আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা হতভম্ব মুখে বললেন, "এটা কী ব্যেপার ! তুমি কী বলছ, রাজা।"

সন্তু ম্লান গলায় বলল, "কাকাবাবু কোনো কথা বুঝতে পারছে না। ঐ গুলি খাওয়ার জন্য বোধহয় মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।"

"সর্বনাশ !"

কাকাবাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, "কী সর্বনাশ ? কেন সর্বনাশ ? কার সর্বনাশ ? তুমি সর্বনাশের কী বোঝো হে ছোকরা !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এ যে খুব খারাপ কেস।"

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওঁর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জাদুকরের ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমি হিপনোটিজম্ জানি। দেখি তাতে কোনো কাজ হয় কি না ! রাজা, আমার চোখের দিকে তাকাও ! এবার মনে করার চেষ্টা করো, তুমি কে ? মনে করো দিল্লির কথা···তুমি দিল্লিতে গত মাসে আমায় কী বলেছিলে···ডিফেন্স কলোনিতে আমার বাড়িতে··· সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল···"

উনি এক পা এক পা করে এগিয়ে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু একবারও চোখের পলক না ফেলে একই রকম গলায়

বললেন, "বাঃ বেশ নাচতে জানো দেখছি। এবার ধেইধেই করে নাচো তো ছোকরা!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য, কোনো কাজ হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, ঘর অন্ধকার করতে হবে। সনটু জানলা-দরোয়াজা বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু চলে গেল বাইরে। নরেন্দ্র ভার্মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

১১

প্রায় আধঘন্টা বাদে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "নাঃ, কিস্‌সু হল না! মাথা একদম গড়বড় হয়ে গেছে। আমার কোনো কথাই বুঝতে পারছেন না।"

সন্তু উদ্‌গ্রীব ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। সে বলল, "তা হলে এখন কী হবে?"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কোনো ডক্‌টর কি তোমার আংকেলকে দেখেছিলেন, সনটু?"

সন্তু বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গেই তো একজন ডাক্তার এসেছিলেন কলকাতা থেকে। ডাক্তার প্রকাশ সরকার। কিন্তু তাঁকে আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "প্রকাশ সরকার···তাকে পাওয়া যাচ্ছে না? কেন?"

"ভোর থেকেই তাঁকে আর দেখতে পাইনি।"

"এসব কী কারবার চলছে এখানে? তবে তো আর এখানে থাকাই চলে না।"

"আমার মনে হচ্ছে এবার কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভাল। ওখানে আমাদের চেনা ভাল ডাক্তার আছে।"

"তা ঠিকই বলেছ। লেকিন তোমার আংকেল ফিরে যাবেন কি

এখানে থাকা পসন্দ করবেন, সেটা তো জানা যাচ্ছে না। উনি তো কোনো কথাই ঠিক ঠিক বুঝছেন না।"

"সে-কথা আমিও ভেবেছি, নরেনকাকা। কাকাবাবু কোনো ব্যাপারেরই শেষ না দেখে কখনো ফিরে যেতে চান না। কিন্তু এখানে আর তো উপায় নেই। এবার আমাদের ডিফিট, মানে হার স্বীকার করতেই হবে।"

"ডিফিট? কিন্তু লড়াইটা কার সঙ্গে সন্টুবাবু? সেটাই তো এখনো বোঝা গেল না। ঠিক আছে, এবার কলকাতাতেই চলে যাওয়া যাক। আজ রাত সাবধানে থাকো। কাল মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতা ব্যাক করব। আমি এখন সার্কিট হাউসে ওয়াপস্ যাচ্ছি।"

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, আমি তবে এখন যাচ্ছি!"

কাকাবাবু হুংকার দিয়ে দিয়ে বললেন, "গেট আউট! যত সব রাস্কেল এসে গোলমাল করছে এখানে!"

নরেন্দ্র ভার্মার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সন্তুরই খুব লজ্জা করতে লাগল কাকাবাবুর ব্যবহারে।

একটু পরেই নরেন্দ্র ভার্মা আবার হাসলেন। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, "ইশ, এমন গুণী মানুষটা একেবারে বে-খেয়াল হয়ে গেছে! ভাল করে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আমি চলি সন্টুবাবু!"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু আবার চিৎকার করে বললেন, "কফি! কেউ আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারে না?"

সন্তু দৌড়ে নীচে চলে গেল কফির অর্ডার দিতে।

কফি আনবার আগেই নার্সটি গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে কাকাবাবুর মুখ-টুখ মুছিয়ে দিয়েছেন আর জামাও পাল্টে দিয়েছেন।

কাকাবাবু কফি খাওয়ার সময় কোনো কথা বললেন না। শুধু মাঝে-মাঝে চোখ তুলে দেখতে লাগলেন সন্তুকে। সন্তুর খুব আশা হল কাকাবাবু তাকে কিছু বলবেন।

কিন্তু কফি খাওয়া শেষ করার পর কাকাবাবু নার্সকে জিজ্ঞেস

করলেন, "তুমি কি চামেলির দিদি?"

নার্স অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চামেলি? চামেলি কে? আমি তো তাকে চিনি না।"

কাকাবাবু তবু জোর দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি চামেলির দিদি। তোমার নাম কী?"

নার্স বললেন, "আমার নাম সুনীতি দত্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই তোমার নাম সুনীতি নয়। তোমার নাম পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগো রে, কেন বোন পারুল ডাকো রে? এবার বলো তো, আমি কে?"

নার্সটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "আমায় চিনতে পারলে না তো? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস, পঞ্চাশটি বাঘ আমার এক এক গেরাস! হালুম!"

নার্স বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমায় খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, কিন্তু আমার বয়েস চল্লিশ।

কাকাবাবু আর কিছু না বলে চোখ বুঁজলেন।

নার্সটি বাইরে চলে এসে সন্তুকেও হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

দু'জনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার পর নার্স জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ভাই, তোমার কাকাবাবুর এই রকম অবস্থা কতদিন ধরে?"

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "বেশি দিন নয়। কারা ওকে বাঘ-মারা গুলি মেরে পালিয়ে গেল—"

"বাঘ-মারা গুলি? বাঘ মারতে আলাদা গুলি লাগে বুঝি?"

"ভুল বলেছি, বাঘ-মারা গুলি নয়। বাঘকে ঘুম-পাড়ানো গুলি। তারপর থেকেই ওঁর গায়ের জোর সব চলে গেল, আর মাথাতেও গোলমাল দেখা দিল।"

"উনি কিচ্ছু মনে করতে পারেন না?"

"না। আমাকেই চিনতে পারছেন না!"

"উনি খুব নাম-করা লোক বুঝি? ওঁর জন্য এখানকার পুলিশ আর

গভর্নমেন্টের বড় বড় অফিসাররা সব ব্যস্ত দেখছি।"

"হ্যাঁ, উনি খুবই নাম-করা লোক।"

"আহা, এমন লোকের এই দশা! জানো না, এই রকম পাগলরা আর কোনোদিন ভাল হয় না।"

সন্তু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, "নিশ্চয়ই ভাল হয়। কলকাতায় অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে!"

নার্সটি সমবেদনার সুরে বলল, "আমি তো ভাই এরকম কেস অনেক দেখেছি, সেইজন্য বলছি। যারা চেনা মানুষ দেখলে চিনতে পারে না, তারা আর কখনো ভালো হয় না! দ্যাখো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে।"

সন্তুর আর নার্সের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। সে সেখান থেকে সরে গেল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশটা লাল। সামনের বাগানটা সেই লাল আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সন্তুর আর বাগানে যাবার সখ নেই। বাস্তু সাপ হোক আ যা-ই হোক, অত বড় সাপের কাছাকাছি সে আর যেতে চায় না।

সন্ধেবেলা দেববর্মন এলেন খবর নিতে।

কাকাবাবু সেই একভাবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সেইজন্য দেববর্মন আর ওঁকে বিরক্ত করলেন না। সন্তুর সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করার পর বললেন, "আমি তা হলে নরেন্দ্র ভার্মার কাছেই যাই। তোমরা যদি কাল চলে যাও, তা হলে সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রাত্তিরটা তা হলে ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। মর্নিং ফ্লাইটে গেলে খুব ভোরে উঠতে হবে। এই নার্স সারারাতই থাকবে এখানে।"

ন'টার মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। কাকাবাবু আর এর মধ্যে একটাও কথা বলেননি। সন্তু অনেকবার ভেবেছিল, কাল কলকাতায় ফিরে যাবার কথা কাকাবাবুকে জানাবে কি না। শেষ পর্যন্ত আর বলতে ভরসা পায়নি। কাকাবাবু হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, শুধু শুধু আবার উল্টোপাল্টা কথা শুনতে

হবে। কাকাবাবুর মুখে ছেলেমানুষি কথা শুনতে সন্তুর একটুও ভাল লাগে না।

কিছুক্ষণ বারান্দার আলো জ্বেলে সন্তু ওডহাউসের লেখা 'আংকল ডিনামাইট' নামে একটা মজার বই পড়ার চেষ্টা করলো খানিকক্ষণ। কিন্তু এই পরিবেশে সে মজার বইতে মন বসাতে পারছে না। এক সময় সে এসে শুয়ে পড়ল কাকাবাবুর পাশের খাটে। নার্স বসে রইলেন চেয়ারে, ঐ ভাবেই উনি সারারাত জেগে থাকবেন।

মাঝরাত্রে একটা চেঁচামেচির শব্দ শুনে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনের বাগানে কে যেন কাঁদছে।

সন্তু মাথার কাছে টর্চ নিয়েই শুয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি সেই টর্চটা নিয়ে ছুটে গেল বারান্দায়। আলো ফেলে দেখল, একটা লোক কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে, "বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!"

তক্ষুনি সন্তু বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। একটা কোনো চোর এসে বাগানে লুকিয়ে ছিল। সে পড়েছে ঐ বাস্তু সাপের পাল্লায়। চোর, না শত্রুপক্ষের কোনো লোক?

সাদা পোশাকের পুলিশ দু'জনও ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। তাদের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সাপটার কাছে।

এইবারে পুলিশ দু'জনের সাড়া পাওয়া গেল। সন্তুও নেমে গেল নীচে।

পুলিশ দু'জন টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করছে, "কে? তুমি কে? বাগানে ঢুকেছ কেন?"

ভয়ে পুলিশ দু'জনও রাত্তিরে বাগানে ঢুকতে চাইছে না। সেই লোকটার গলা নেতিয়ে আসছে, বোধহয় এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আলো ফেলে সন্তু দেখল সাপটা ঐ লোকটার একটা পা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কামড়ায়নি। ফণাটা লকলক করছে বাইরে। বাস্তু সাপের গুণ আছে বলতে হবে।

দু'তিনটে টর্চের আলো পড়ায় সাপটা আস্তে আস্তে লোকটাকে

ছেড়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। লোকটা টলতে টলতে ছুটে এল এদিকে।

একজন পুলিশ লোকটার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুই কে?"

কিন্তু লোকটা উত্তর দেবার অবসরও পেল না। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শব্দ করে একটা ট্রেকার ঢুকল গেট পেরিয়ে। গেট কী করে খোলা ছিল তা বোঝা গেল না।

সন্তু ভাবল, নিশ্চয়ই নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা দেববর্মনরা কেউ এসেছেন জরুরি কোনো খবর দিতে।

ট্রেকারটা বাড়ির সামনে এসে যাবার আগেই তার থেকে টপাটপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের মুখে সরু মুখোশ আঁটা। তাতে তাদের চোখ দেখা যায় না। সবাইকেই এক-রকম দেখায়। একজনের হাতে একটা মেশিনগান, অন্য দু'জনের হাতে রিভলভার। পুলিশ দু'জনের বুকের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে ওদের দু'জন বলল, "মরতে যদি না চাস তো চুপ করে থাক্।"

সন্তু এরই মধ্যে তীরের মতন ছুটে উঠে গেল দোতলায়। কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাপাতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল দুম দুম করে।

নার্সটি উঠে দাঁড়িয়ে সন্তুকে বলল, "কী বোকার মতন দরজা বন্ধ করে দিলে? ওরা বুঝি দরজা ভাঙতে জানে না?"

নার্স নিজেই খুলে দিল দরজার ছিটকিনি। তিনজন লোক এক সঙ্গে ঢুকে পড়ল, তাদের একজনের হাতে মেসিনগান। একজন সন্তুর মুখ চেপে ধরল। মেসিনগানধারী বলল, "চলুন মিঃ রায়চোধুরী।"

গোলমালে কাকাবাবু জেগে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে বললেন, "রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব!"

আগন্তুকদের একজন বলল, "নার্স, তোমার পেশেন্টকে তৈরি করে নাও, এক্ষুনি যেতে হবে।"

নার্স বললেন, "সব তৈরিই আছে। আমি চট করে ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিচ্ছি।"

নার্স একটা সিরিঞ্জ বার করে কাকাবাবুর ডান হাতে একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া মাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল। সন্তুকেও অন্য লোকটি ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এল বাইরে।

মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেকার গাড়িটি ওদের তুলে নিয়ে আবার স্টার্ট দিল।

১২

গাড়িটা গেস্ট হাউসের গেট ছাড়িয়ে বাইরে পড়বার পর লোকগুলো দুটো কালো কাপড় দিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুর চোখ বেঁধে দিল। কাকাবাবুর তো বাধা দেবার কোনো ক্ষমতাই নেই, সন্তুও বুঝল বাধা দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

নার্স সুনীতি দত্ত ওদের সঙ্গেই এসেছে আর লোকগুলোর সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই নার্স তাহলে শত্রুপক্ষেরই লোক। কাকাবাবুর মাথার গোলমাল হলেও এটা তো ঠিকই বুঝেছিলেন। এই জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, এই নার্স হচ্ছে চামেলির দিদি।

সন্তু কাকাবাবুকে কোনোদিন গান গাইতে শোনেনি। কিন্তু এখন এই চলন্ত গাড়িতে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরেছেন। মেশিনগান ও রিভলভারধারী কয়েকজন দস্যুর সঙ্গে যে তিনি বসে আছেন সে-ব্যাপারে যেন তাঁর কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। অথচ সন্তুর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। কাকাবাবু যে গান গাইছেন, তার সুরও যেমন বে-সুরো, কথাগুলোও অদ্ভুত।

কাকাবাবু গাইছেন :

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে।
ত্রিপুরায় যারা যায়
তারা খুব কাঁঠাল খায়।

ধর্মনগর উদয়পুর

কোন্‌দিকে আর কতদূর···

এই রকম আরও কী সব যেন কাকাবাবু একটানা গেয়ে যেতে লাগলেন, সন্তু সব কথা বুঝতে পারল না গাড়ির আওয়াজে। গাড়িটা যে খুব জোরে ছুটছে, তা বোঝা যায়। সন্তু মনে-মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ঘণ্টায় কত মাইল? পঞ্চাশ? ষাট? রাত্তিরবেলা রাস্তা ফাঁকা, আরও বেশিও হতে পারে।

এই রকম বিপদের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়? কাকাবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সন্তুরও ঝিমুনি এসেছিল খানিকটা, হঠাৎ আবার ধড়ফড় করে উঠে বসলো।

আর অমনি একজন কেউ তার মাথায় একটা চাপড়া মেরে বলল, "চুপ করে বসে থাক্। অত ছটফটানি কিসের?"

অন্যান্যবারে সন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি বিপদের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু আগে সব সময়ই মনে হয়েছে, কাকাবাবু কিছু না কিছু একটা উপায় বার করবেনই। কিন্তু এবারে কাকাবাবুরই তো মাথার ঠিক নেই। এবারে আর উদ্ধার পাওয়া যাবে কী করে?

কাকাবাবুর মতন একজন অসুস্থ লোককে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকগুলো এত ব্যস্ত কেন, তাও সন্তু বুঝতে পারছে না। পুরনো কোনো শত্রুতা?

গাড়ির গতি কমে এল আস্তে আস্তে। তারপর থামল এক জায়গায়। সন্তুর চোখ বাঁধা। তাকে এখন কী করতে হবে সে জানে না।

একজন লোক সন্তুর হাত ধরে ট্রেকার থেকে নীচে নামাল।

একজন কেউ হুকুমের সুরে বলল, "ছেলেটার চোখ খুলে দাও; কিন্তু হাত বেঁধে রাখো ওর। খেয়াল রেখো, ও কিন্তু মহা বিচ্ছু ছেলে।"

সন্তুর চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর সে দেখল অনেক গাছপালার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থেমেছে তাদের গাড়ি। সেই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বামতন লোক,

নস্যি রঙের স্যুট পরা, চোখে কালো চশমা। অন্ধ ছাড়া আর কেউ যে রাত্তিরে কালো চশমা পরে, তা সন্তু আগে জানত না।

একজন লোক কাকাবাবুরও এক হাত ধরে নিচে নামাতে গেল। কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। বেশ জোরেই পড়েছেন, কারণ সন্তু ঠকাস করে ওঁর মাথা ঠুকে যাবার শব্দ পেল।

কালো-চশমা পরা লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "ইডিয়েট! সাবধানে! জানো না, ওর এক পায়ে চোট আছে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না! একজন ওর মাথার কাছে রিভলভার ধরে থাকো, কখন যে কী করবে ঠিক নেই। ওকে সার্চ করেছ?"

দু'জন লোক কাকাবাবুকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন বলল, "হ্যাঁ, সার্চ করে দেখেছি, কাছে কোনো ওয়েপন্ নেই।"

কাকাবাবুর গায়ে স্লিপিং স্যুট। খালি পা। আছাড় খাবার সময় নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কিন্তু তাঁর যেন সে বোধই নেই। তিনি আবার গুনগুন করে গান ধরলেন:

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে।
যারা যায় ত্রিপুরায়
যখন-তখন আছাড় খায়···।

লম্বা, কালো-চশমা লোকটি বিস্ময়ে একটা শিস দিয়ে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, "গান গাইছ, অ্যাঁ? কী রায়চৌধুরী, নেশা-টেশা করেছ নাকি?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "পি লে, পি লে, হরিনাম কা পেয়ালা··· ঠুন ঠুন ঠুন। মাতোয়ালা, মাতোয়ালা, হরিনাম কা পেয়ালা!"

লোকটি এক হাত বাড়িয়ে কাকাবাবুর থুতনি ধরে উঁচু করে বললেন, "ওসব নকশা ছাড়ো। কী রায়চৌধুরী, আমায় চিনতে পারো?"

কাকাবাবু একদৃষ্টে লোকটির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "চেনা চেনা লাগছে। তুমি পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা না?"

লোকটি ঠাস করে এত জোরে চড় মারল কাকাবাবুর গালে যে, কাকাবাবুর মুখটা ঘুরে গেল। তারপর অন্য গালে ঠিক তত জোরে আবার একটা চড় মেরে লোকটা বলল, "এবার নেশা কেটেছে? এবার ভাল করে ছাখো তো চিনতে পারো কি না?"

কাকাবাবু আবার লোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। সেই একই রকম গলায় বললেন, "হুঁ, আগের বারে ভুল হয়েছিল। তুমি আসলে রামগড়ুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসব, না না না না!"

লোকটি আবার মারবার জন্য হাত তুলতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "মারবেন না, মারবেন না। উনি সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ!

সন্তু দারুণ চমকে উঠল। এ তো ডাক্তার প্রকাশ সরকারের গলা!

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সন্তু তাকে দেখতে পেল না। বেশি খুঁজবারও সময় নেই। সন্তু আবার এদিকে তাকাল।

কালো-চশমা পরা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী অতি ধুরন্ধর! ওসব ভেক আমি জানি। ওর পেটের কথা আমি ঠিক বার করবই। দেখি ও কত মার সহ্য করতে পারে।"

লোকটি আবার এক চড় কষাতে গেল কাকাবাবুকে। তার আগেই সন্তু ছুটে গিয়ে এক ঢুঁ মারল লোকটার পেটে। আচমকা আঘাত পেয়ে লোকটা তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে-সঙ্গে অন্য তু'জন লোক এসে চেপে ধরল সন্তুকে। একজন তার কপালের ওপর রিভলভারের নল চেপে ধরল।

লম্বা লোকটি উঠে পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "বলেছিলুম না, এটা একটা শয়তানের বাচ্চা। ওর ব্যবস্থা আমি পরে করছি। আগে বুড়োটাকে টিট করি।"

কাকাবাবু এই সব কোনো ব্যাপারেই একটুও বিচলিত হননি। মুখে এখনও মৃত্যু-মৃত্যু হাসি। লম্বা লোকটি তাঁর মুখোমুখি হতেই তিনি বললেন, "তা হলে কী ঠিক হল? তুমি পান্তভূতের ছানা, না রামগড়ুড়ের ছানা?"

লম্বা লোকটি অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলল, "রায়চৌধুরী, তোমার সঙ্গে আমি এক তাঁবুতে কাটিয়েছি সাত দিন। তুমি আমায় চিনতে ঠিকই পারছ। তুমি ভালয় ভালয় জঙ্গলগড়ের সন্ধানটা দিয়ে দাও। তারপর তোমায় ছেড়ে দেব। নইলে এখান থেকে তোমার বেঁচে ফেরার কোনো আশাই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গলগড়? সে আবার কী? এর কথা তো সুকুমার রায় লিখে যাননি। জঙ্গলগড়ের বদলে তুমি চণ্ডীগড়ে যেতে চাও? কিংবা গড়মান্দারনপুর?"

লম্বা লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, এদের ওপরে নিয়ে চলো। হাত-পা বেঁধে রাখবে। তারপর আমি দেখছি।"

১৩

কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না জেনেও দু'জন লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। কাকাবাবুর খুবই ব্যথা লাগছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কিছুই বলছেন না। সন্তুও যে কিছু করবে তার উপায় নেই। আর দু'জন লোক তার জামার কলার ও চুলের মুঠি ধরে আছে। তার নড়বার উপায় নেই।

মুখোশধারীরা দোতলায় একটা হলঘরে নিয়ে এল ওদের। হল-ঘরটায় একটি মাত্র চেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। কাকা-বাবুকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল সেই চেয়ারে। হাত-বাঁধা অবস্থায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল তাঁর পায়ের কাছে।

বাকি লোকগুলো ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে শুধু টিমটিম করে একটা কম-পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মনে হয়, এ বাড়িতে অন্য সময় কোনো মানুষজন থাকে না।

নস্যিরঙের সুট পরা লোকটি ঘরে ঢুকল সবার শেষে। হুকুমের সুরে বলল, "সরো! সরে যাও, সামনে থেকে!"

অমনি অন্যরা সরে গিয়ে সামনে জায়গা করে দিল।

লোকটি কাকাবাবুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল কোমরে দু'হাত দিয়ে। ঠিক সিনেমার ভিলেনের মতন। চোখ থেকে এখনও কালো চশমাটা খোলেনি। একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল, "রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমার সামনে ভড়ং করে থেকো না। তাতে কোনো লাভ হবে না। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি যা চাই, তুমি যদি ভালয় ভালয়—"

কাকাবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে দিয়ে ,বললেন, "ডাবের জল! আমি একটু ডাবের জল খাব!"

লম্বা লোকটি হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "ডাবেব জল ?"

পাশ থেকে তার এক অনুচর বলল, "এদিকে তো ডাব পাওয়া যায় না।"

লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "চুপ করো! ডাবের জল কেন, এখন কোনো জলই ওকে দেওয়া হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "জল দেবে না তাহলে জলপাই দাও ? এখানে ডাব পাওয়া যায় না, কিন্তু জলপাই তো পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে একটু নুন দিও!"

লম্বা লোকটি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। রাগে তার হাত কাঁপছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "তোমার সঙ্গে মশকরা করবার জন্য আমি রাতদুপুরে ধরে এনেছি ? আমার কথার সোজাসুজি উত্তর দাও, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। নইলে—"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কে বাপু ? নইলে বলে থেমে রইলে ? কালো চশমায় চক্ষু ঢাকা, গোঁফখানি তো ফড়িং-পাখা!"

লোকটি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর বাঁ হাতখানা তুলে তার তালুতে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল।

কাকাবাবুর হাত অসাড়, তাই তিনি কোনো ব্যথা পেলেন না, মুখে টুঁ শব্দও করলেন না। কিন্তু সন্তু ঐ কাণ্ড দেখে শিউরে উঠল।

তখন মুখোশধারীদের পেছন থেকে ঠেলে সামনে এসে প্রকাশ সরকার বলল, "দেখুন, রাজকুমার, আমি একজন ডাক্তার। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওঁর মাথায় সত্যিই গোলমাল হয়েছে। উনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। ওঁর ওপর অত্যাচার করে কোনো লাভ হবে না।"

"তাহলে তোমার মতে কী করা উচিত এখন?"

"এখন ওঁর চিকিৎসা করানো উচিত। পর পর কয়েকদিন টানা ঘুমোলে উনি একটু সুস্থ হতে পারেন।"

"সে সময় আমার নেই!"

"কিন্তু অত্যাচার করলে ফল খারাপ হবে।"

নার্স সুনীতি দত্ত বললেন, "দেখুন, আমিও তো আজ সারাদিন ধরে ওঁকে ওয়াচ করেছি। উনি সত্যিই এখন মানসিক রুগি। নিজের ভাইপোকেও চিনতে পারেন না। দিল্লি থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছিলেন, তাঁকেও কী সব গালমন্দ করলেন।"

লম্বা লোকটি আরও রেগে গিয়ে বলল, "মাথা খারাপ হয়েছে? বললেই হল? জানো, জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে? আর কোথাও নেই, আছে ওর মাথার মধ্যে! কর্নেল!"

মুখোশধারীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, "স্যার?"

"শোনো, যে-করেই হোক ওর কাছ থেকে কথা বার করতে হবে।"

যে-লোকটিকে কর্নেল বলে ডাকা হল, তার অবশ্য মিলিটারিদের মতন পোশাকও নয়, তার মিলিটারি গোঁফও নেই। এমনই সাধারণ চেহারার কটা লোক।

সে বলল, "স্যার, জঙ্গলগড় জায়গাটা আসলে কোথায়? আমরা তো এদিকে জঙ্গলগড় বলে কোনো কিছুর নাম শুনিনি।"

লম্বা লোকটি ভেংচি কেটে বলল, "সে-কথা আমি তোমায় বলে দি, আর তুমি তারপর আমার পেছন থেকে ছুরি মারো, তাই না? তখন নিজেই তার লোভে পাগল হয়ে উঠবে। শোনো, জঙ্গলগড়ের ভেতরের জিনিসের ওপর একমাত্র আমারই বংশগত অধিকার আছে।

আর কারুর নেই। এই লোকটা বাগড়া না দিলে এতদিনে আমি সব-কিছু পেয়ে যেতাম।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "জঙ্গলগড় নয়, জঙ্গলগড় নয়, বোম্বাগড়! এতক্ষণে চিনলাম, তুমি হলে বোম্বাগড়ের রাজা। আর তুমি খাও আমসত্ত্ব ভাজা!"

লম্বা লোকটি ঝট করে কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আর তুমি কী খাও, তা মনে আছে? তুমি ছাগলের মতন কাগজ খাও! তুমি আমাদের ম্যাপটা খেয়ে ফেলেছিলে।"

কর্নেল নামের লোকটা বলল, "ম্যাপ খেয়ে ফেলেছিল?"

হ্যাঁ। বলতে গেলে আমারই চোখের সামনে। অ্যাত্ত বড় একটা তুলোট কাগজের ম্যাপ। আমি সেটা গায়েব করার আগেই ও সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল। ম্যাপটা আগেই ও মুখস্থ করে ফেলেছিল। এখন ও ছাড়া আর কেউ সে পথের হদিস দিতে পারবে না।"

"হয়তো এই বুড়োটা সেই ম্যাপ আবার অন্য কোনো জায়গায় এঁকে রেখেছে।"

"না! ও অতি শয়তান। সে সুযোগ ও দেবার পাত্র নয়। ওরা আগরতলায় চলে আসবার পর আমার লোকেরা ওদের কলকাতার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। সেখানে কিছু নেই। দিল্লিতেও পাঠায়নি, সেখানেও আমাদের লোক রেখেছি। সুতরাং ম্যাপটা ওকে দিয়েই আঁকাতে হবে। কিংবা ও নিজেই যদি গাইড হয়ে আমাদের পথের সন্ধান দিতে রাজি হয়—।"

তারপর সে কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, "কী রায়চৌধুরী, রাজি?"

কাকাবাবু বললেন, "এক থালা শুপারি, গুনতে নারে ব্যাপারি, বলো তো কী? কিংবা এইটা পারবে? চক্ষু আছে মাথা নাই, রস খাব, পয়সা কোথা পাই?"

কালো-চশমা হুংকার দিয়ে বলল, "কর্নেল! তোমার ছুরিটা

বার করো।"

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং ছুরি বার করল। তার স্প্রিং টিপতেই চকচকে ফলাটা বেরিয়ে এল।

কালো-চশমা বলল, "ঐ ছুরি দিয়ে ওর বুক চিরে দাও, দেখি তাতে ওর মুখ খোলে কি না।"

কাকাবাবুর জামার বোতামগুলো খুলে বুকটা ফাঁক করে ফেলল কর্নেল। ছুরিটা খুব আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে বুকে ঠেকাল।

সন্তু সেই সময় ছটফট করে উঠতেই লম্বা লোকটির ইশারায় দু'জনে গিয়ে চেপে ধরে রইল তাকে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করল, "কতটা ঢোকাব ছুরি?"

"রক্ত বার করো!"

কর্নেল হালকাভাবে একটা টান দিতেই লম্বা রেখায় রক্ত ফুটে উঠল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবাক হয়ে দেখছেন এই সব কাণ্ড-কারখানা। তাঁর মুখে কোনোরকম যন্ত্রণার চিহ্নই নেই।

প্রকাশ সরকার আবার এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বলল, "আমি ডাক্তার, আমার কথাটা শুনুন। এভাবে কথা আদায় করা যাবে না। ওঁর মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

লম্বা লোকটি বলল, "হুঁ, তোমার যে দেখছি খুব দরদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমিও থাকো এখানে। কী করে পাগল জব্দ করতে হয় আমি জানি। কর্নেল, উঠে এসো। এই তিনটেকে এখানেই আটকে রেখে দাও। এদের খাবার দেবে না, জল দেবে না, এমন কী ডাকলে সাড়াও দেবে না। শুধু বাইরে থেকে পাহারা দেবে। দেখি কতক্ষণ লাগে শিরদাড়া ভাঙতে!"

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একে একে। কালো-চশমা পরা লোকটা দরজার কাছ থেকেও ফিরে এল আবার।

কাকাবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে চরম বিদ্রূপের সুরে বলল, "রায়-চৌধুরী, আমি বাজি ফেলতে পারি, তুমি চব্বিশ ঘণ্টাও তোমার জেদ

বজায় রাখতে পারবে না। আর যদি সত্যিই তুমি পাগল হয়ে থাকো, তবে সেই দোষে এই দু'জনও খিদেতেষ্টায় ছটফট করে মরবে! আমার কোনো দয়ামায়া নেই।"

কাকাবাবুর নড়বড়ে অবশ হাত দুটি এবারে বিদ্যুতের মতন উঠে এল ওপরে! তিনি বজ্রমুষ্টিতে লম্বা লোকটির গলা চেপে ধরে প্রকাশ সরকারকে বললেন, "শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও ভেতর থেকে।"

১৪

কাকাবাবু বজ্রমুষ্টিতে গলা চেপে ধরায় লম্বা লোকটা দু'বার মাত্র আঁ আঁ শব্দ করল। একটা হাত কোটের পকেটে ভরে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কাকাবাবু ওর অচৈতন্য দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে প্রকাশ সরকারকে বললেন, "বললুম যে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এসো! এক্ষুনি ওর দলের লোকেরা ফিরে আসবে!"

প্রকাশ সরকার এতই অবাক হয়ে গেছে যে, নড়তেই পারছে না যেন। সন্তুরও সেই অবস্থা।

এবার প্রকাশ সরকার দৌড়ে গেল দরজা বন্ধ করতে। কাকাবাবু নিচু হয়ে সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন।

সন্তুর এমন অবস্থা যে, সে যেন কথাই বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলেই যেন তার ফুঁপিয়ে কান্না এসে যাবে। তার এত আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ সরকার দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, "স্যার, আপনি ভাল হয়ে গেছেন? মিরাকুলাস ব্যাপার! শুনেছি, সাড্‌ন শক্ পেলে এরকম হতে পারে!"

কাকাবাবু বললেন, 'এই লোকটার কোটের পকেটে রিভলভার আছে। সেটা বার করে আমায় দাও!"

প্রকাশ সরকার বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এমনই উল্টোপাল্টা করলে লাগল যে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার কোটের পকেটই সে খুঁজে পেল না।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "শিগগির! যে-কোনো মুহূর্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

শেষ পর্যন্ত প্রকাশ সরকার রিভলভারটা খুঁজে পেল। কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে তাতে গুলি ভরা আছে কি না চেক করে দেখলেন।

এবার সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আসলে আপনার কিছুই হয়নি, তাই না?"

প্রকাশ সরকার বলল, "অভিনয়? মানুষ এরকম অভিনয় করতে পারে?"

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

প্রকাশ সরকার বলল, "সত্যিই স্যার, আপনার কিছু হয়নি? আপনি আমাদের পর্যন্ত ঠকিয়েছেন?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আপনি ইচ্ছে করে এরকম সেজেছিলেন, নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "হাত দুটো ক'দিনের জন্যে সত্যিই অসাড় হয়ে গিয়েছিল রে! পরশু থেকে হঠাৎ আবার ঠিক হয়ে গেল, তখন ভাবলুম, কিছুদিন ঐ রকম সেজে থাকা যাক।"

প্রকাশ সরকার জিজ্ঞেস করল, "আপনার মাথাতেও তাহলে কোনো গোলমাল হয়নি?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "মাথাটায় খুব ব্যথা করত মাঝে মাঝে। এক-এক সময় ভাবতুম, পাগলই হয়ে যাব নাকি! তা সত্যি সত্যি কি আমি পাগল হয়েছি? তোমাদের কী মনে হয়?"

"স্যার, আপনার হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরল, তবু আপনি একটুও মুখ বিকৃত করলেন না। এটা কী করে সম্ভব?"

কাকাবাবু বললেন, "ইচ্ছে করলে সবই পারা যায়।"

বাঁ হাতটা দেখলেন তিনি। সেখানে একটা বড় ফোশকা পড়ে গেছে এর মধ্যেই।

এই সময় দরজায় ভুনভুন্ করে ধাক্কা পড়ল। বাইরে থেকে সেই 'কর্নেল' উত্তেজিভাবে ডাকল, "রাজকুমার! রাজকুমার।"

প্রকাশ সরকার বিবর্ণ মুখে বলল, "সাড়া না পেলে ওরা তো দরজা ভেঙে ফেলবে! ওদের দলে অনেক লোক!"

কাকাবাবু বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এক্ষুনি এসে পড়বে?"

সন্তু বলল, "নরেনকাকা? তিনি কী করে জানবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তাকে বলা আছে, আমাকে ধরে নিয়ে আসার পর ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে যেন না আসে। এদের পালের গোদাটা কে, তা জানা দরকার। আধঘণ্টার মধ্যেই ভার্মা আসবে।"

প্রকাশ সরকার বলল, "কিন্তু, কিন্তু, আপনি এত বড় ঝুঁকি নিলেন? এরা অতি সাজ্ঘাতিক লোক। আগেই যদি আপনাকে মেরে ফেলত?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমাকে ওরা মারবে কেন? আমি মরে গেলেই তো ওদের দারুণ ক্ষতি! জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে জানো? আর কোথাও নেই, আছে আমার মাথার মধ্যে। আমাকে মারলে ওদের এত কাণ্ড করা সব ব্যর্থ হয়ে যেত। জঙ্গলগড়ের সন্ধান আর কেউ পেত না!"

দরজায় আবার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এই রাজকুমার কে? ওকে আপনি আগে চিনতেন?"

কাকাবাবু বললেন, "রাজকুমার না ছাই! এখানে এরকম গণ্ডায় গণ্ডায় রাজকুমার আছে। অনেক রাম-শ্যাম-যদুও নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ-ও ঠিক পালের গোদা নয়। আর একজন কেউ আছে। আমারই ভুল হল, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলুম না।"

দরজায় দমাস-দমাস শব্দ হচ্ছে। ওরা কোনো ভারী জিনিস দিয়ে দরজায় আঘাত করছে। কিন্তু পুরনো আমলের শক্ত কাঠের উঁচু দরজা। ভাঙা সহজ নয়।

কাকাবাবু বললেন, "ঐ লোকটাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

সন্তু আর প্রকাশ সরকার লোকটিকে ধরাধরি করে কাকাবাবুর পায়ের কাছে নিয়ে আসতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধরে অন্য-হাতের রিভলভারের ডগাটা তার ঘাড়ে ঠেকালেন। তারপর বললেন, "এই যে রাজকুমার, ঘুম ভেঙেছে?"

লোকটি হাত তুলে নিজের গলায় বুলোতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, নড়াচড়া একদম চলবে না। পট্ করে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। আমি দেখে নিয়েছি, ছ'খানা গুলি ভরা আছে।"

লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তা হলে তুমি পাগল হওনি! যাক, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু তুমি কি এরকম ভাবে জিততে পারবে? আমার লোক এক্ষুনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আসুক না, তাতে কোনো চিন্তা নেই। শোনো, আমি সিগারেট খাই না। না হলে তোমার হাতে আমারও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া উচিত ছিল।"

প্রকাশ সরকার বলল, "স্যার, আমার কাছে সিগারেট আছে। ধরাব?"

লোকটি কটমট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার আমি সর্বনাশ করে দেব।"

প্রকাশ সরকার বলল, "আপনি যা খুশি করতে পারেন, আর আমি ভয় পাই না!"

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে কাচুমাচু ভাবে বলল, "দেখুন, আমি কিন্তু ওদের দলের নই। সেদিন সকালবেলা আমার এক বন্ধুর নাম করে এদের লোক আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর এখানে

ধরে নিয়ে আসে। আমার একটা গোপন ব্যাপার এরা জানে, সে-কথা বলে ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে। সব কথা আপনাকে আমি পরে খুলে বলব।"

দরজার খিলটা এবার মড়মড় করে খানিকটা ভেঙে গেল। এবার ওরা ভেতরে ঢুকে আসবে।

সন্তু বলল, "আমি আর প্রকাশদা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াব?"

কাকাবাবু বললেন, "কোনো দরকার নেই। তোরা দুজনে বরং দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়া। হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে তোদের গায়ে লাগতে পারে।"

দরজা ভেঙে প্রথমেই এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে ঢুকল 'কর্নেল', তারপর আরও চার-পাঁচজন লোক।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আর এক পা-ও এগিও না। তা হলে তোমাদের রাজকুমারের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ওহে রাজকুমার, তোমার লোকদের বলো পিছিয়ে যেতে!"

রাজকুমার নামের লোকটি হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার গলা টিপে অজ্ঞান করে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছ বলেই জিততে পারবে? কর্নেল, এগিয়ে এসো!"

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান! আমি সত্যি গুলি করব। প্রথমে তোমাকে, তারপর ওদের!"

রাজকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "মিথ্যে ভয় দেখালেই আমি ভয় পাব? রাজা রায়চৌধুরীকে আমি ভাল করেই জানি, সে কখনো কোনো মানুষ খুন করতে পারবে না। তুমি আমায় কেমন মারতে পারো দেখি তো! কর্নেল, এ যদি আমায় মেরেও ফেলে, তবু তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ধরে ফেলো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠিক তিন গুনব। তারপর..."

রাজকুমার বলল, "কর্নেল, ওর কথায় বিশ্বাস কোরো না! ও গুলি করে আমায় কিছুতেই মারবে না আমি জানি। তোমরা এগিয়ে এসো!"

১৫

সন্তুর বুকের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছে। এক্ষুনি একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। কাকাবাবু কি ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোককে সত্যিই গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? কাকাবাবু যে ভয় দেখাচ্ছেন, তা কি ঐ "কর্নেল" নামে লোকটা বিশ্বাস করবে?

একবার সে চট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল। প্রকাশ সরকারও সন্তুর মতন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে একটু-একটু সরে যাবার চেষ্টা করছে পাশের বারান্দার দিকে। বারান্দার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে প্রকাশ সরকারের। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে সন্তুকে ইশারা করল এদিকে সরে আসবার জন্য।

কর্নেল আর তার পেছনে তিনজন লোক একটু ঝুঁকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন যে-কোনো সময় তারা বাঘের মতন কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাজকুমারের ঘাড়ে রিভলবারের নলটা ঠুসে ধরে কাকাবাবু বললেন, "আমি শেষবার বলছি, আর এক পা-ও এগোবে না। আমি ঠিক তিন পর্যন্ত গুনব, তারপরই গুলি করব!"

রাজকুমার বলল, "ওর কথা গ্রাহ্য কোরো না কর্নেল। এগিয়ে এসে ওকে ধরো!"

কাকাবাবু বললেন, "এক!"

কর্নেল তবু এক পা এগিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, "দুই!"

রাজকুমার বলল, "কর্নেল, তুমি শুধু-শুধু দেরি করছ কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি তো বলছি, ভয় নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা আমায় চেনো না! আমি কখনো স্বেচ্ছায় ধরা দিই না। আর আমার ওপর কেউ অত্যাচার করলে তার

প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়ি না। রাজকুমার, তুমি আমার গালে চড় মেরেছ, আমার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছ। এর শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। শাস্তি আমি নিজের হাতে দিতে চাই না, পুলিশের হাতে তোমায় তুলে দেব। তোমার ভালর জন্যই বলছি. এই লোক-গুলোকে চলে যেতে বল। ওরা যদি আর এগিয়ে আসে. তা হলে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে বাধ্য হব।"

এবারে 'কর্নেল' বলল. "শুনুন মোশাই। আপনি তো অনেক কথা বললেন, এবারে আমি একটা কথা বলি। আপনি যদি বাই চান্স রাজকুমারকে গুলি করেন, তা হলে তারপর আপনাকে তো মারবই, এই এই বাচ্চা ছোঁড়াটাকে আর ডাক্তারটাকেও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব! আমি মোশাই এক কথার মানুষ। রাজকুমারকে আপনি ছেড়ে দিন। তা হলে আপনাদেরও আমি মারব না। কাটান-কুটিন হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আগে তোমরা সবাই ঘরের বাইরে চলে যাও—হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো, তারপর—।"

রাজকুমার চেঁচিয়ে উঠল, "খবর্দার. এর কথা বিশ্বাস করবে না। বলছি তো, এ লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করছে। আমাকে মারবার হিম্মত ওর নেই! এরা মিড্‌ল ক্লাস ভদ্দরলোক, এরা গুলি করে মানুষ মারতে পারে না। তোরা সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় আমার ওপরে—।"

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

রাজকুমার নিজেকে ছাড়াবার জন্য শরীর মোচড়াতেই কাকাবাবু এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলেন 'কর্নেল'-এর পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা তুলে ঠেকালেন নিজের কপালে।

অন্যরা রাজকুমারকে ঝটপট তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। একজনের হাত থেকে একটা রিভলবার নিয়ে রাজকুমার এদিকে ফিরতেই দেখল কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার? অন্য লোককে গুলি করতে পারি না বটে, কিন্তু নিজেকে গুলি করতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না।

আমাকে ধরবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। আর আমি যদি এখন মরে যাই তা হলে, রাজকুমার, তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ? যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে তোমায় আর আস্ত রাখবে? জঙ্গলগড়ের চাবি আছে আমার মাথার মধ্যে। তোমার হাতে ধরা দেবার আগে আমি আমার এই মাথাটাই উড়িয়ে দেব। জঙ্গল গড়ের চাবি চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।

রাজকুমার ঝট করে মুখ ফিরিয়ে দেখল সন্তুকে।

কাকাবাবু বললেন, "শোনো! আমি মরলে তোমার কোনো লাভ নেই, ক্ষতিই বেশি। আমারও আপাতত মরবার ইচ্ছে নেই। সুতরাং, এসো, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। জঙ্গলগড়ের সন্ধান যদি আমি দিই, তা হলে তোমরা তার বদলে আমায় কত টাকা দেবে?"

রাজকুমার বললো, "টাকা? এর আগে তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।"

"উঁহুঃ! অত কমে হবে না। তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

"আমায় কেউ পাঠায়নি! কে পাঠাবে? জঙ্গলগড়ের যা কিছু সবই আমার পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। এর ওপর সব দাবি আমার। যা কিছু বলার সব আমার সঙ্গেই বলতে হবে।"

"বেশ তো! ঠাণ্ডা মাথায় অনেক কিছু আলোচনা করা দরকার। তোমার এখানে চা কিংবা কফির কিছু ব্যবস্থা নেই? এখন সন্তু আর প্রকাশকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও। ওরা বিশ্রাম নিক।"

রাজকুমার এবারে হা-হা করে হেসে উঠল। যেন কয়েক টুকরো হাসি সে ছুঁড়ে দিল কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর বলল, "রায়-চৌধুরী, তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না? আর আমরা সব বোকা, কিছু বুঝি না?"

লম্বা হাত বাড়িয়ে সে সন্তুর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর সন্তুর ডান দিকের কানের ফুটোর মধ্যে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বলল। "নাউ হোয়াট? তুমি নিজে মরতে

ভয় পাও না জানি, কিন্তু তোমার ভাইপোকে যদি মেরে ফেলি ? এই জন্যই তুমি ওকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইছিলে !"

কাকাবাবু বললেন, "আর, এসব নাটকের কী দরকার ? বললুম তো তোমার সঙ্গে আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি। আমি কত কষ্ট করে জঙ্গলগড়ের সন্ধান বার করেছি, সে জন্য কিছু পাব না ?"

রাজকুমার বলল, "তোমায় কিছু দেব না। তুমি আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছ ! এবারে তুমি এক্ষুনি জঙ্গলগড়ের সব সন্ধান দিয়ে দাও, নইলে এ ছেলেটাকে এক্ষুনি শেষ করব !"

এর মধ্যে টকাং করে একটা শব্দ হল। প্রকাশ সরকার এই সব কথাবার্তার সুযোগে বারান্দার দরজার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছে।

কিছু একটা করবার জন্য 'কর্নেল'-এর হাত নিশপিশ করছিল। এবারে সে লাফিয়ে গিয়ে তার রিভালবারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল প্রকাশ সরকারের মাথায়। প্রকাশ সরকার একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে ঢলে পড়ে গেল।

সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজকুমার। এমন একটা ভাব করল। যেন কিছুই হয়নি।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার চটপট বলে ফেল। শোনো রায়চৌধুরী, আমরা রাজপরিবারের লোক। দরকার হলে দু-চারটে লোক মেরে ফেলতে আমাদের একটুও ভুরু কাঁপে না।"

সন্তু বলল, "আপনি আমায় মেরে ফেললেও কাকাবাবু কোনো অন্যায় মেনে নেবেন না !"

রাজকুমার বলল, "চোপ্ !"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে তুমি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছ, রাজকুমার। তোমাদের এত সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রম। জঙ্গগড়ে আসলে কিছুই নেই। হয়ত কিছু ছিল এক সময় ঠিকই, কিন্তু আগেই কেউ তা সব সাফ করে নিয়ে গেছে !"

"সেটা আমরা বুঝব কিছু আছে কি নেই। আমরা সেখানে গিয়ে

নিজের চোখে দেখতে চাই !"

"ওকে ছেড়ে না দিলে আমি কিছুই বলব না !"

"বলবে না ? তবে দ্যাখো, আমি প্রথমে এক গুলিতে এর পা খোঁড়া করে দিচ্ছি। তারপর এক এক করে···

এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে বলল, "রাজকুমার ! রাজকুমার ! এক দল লোক আসছে এদিকে। বোধহয় মিলিটারি !"

অমনি 'কর্নেল' আর অন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, "কটা গাড়ি ?"

লোকটি বলল, গাড়ি নেই, দৌড়ে দৌড়ে আসছে !"

রাজকুমার কাকাবাবুর দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "মিলিটারি এলেও তুমি নিস্তার পাবে না রায়চৌধুরী। আমরা তোমার ভাইপোকে নিয়ে চললুম। যদি একে প্রাণে বাঁচাতে চাও, তাহলে আমাদের কাছে তোমাকে নিজে থেকেই আসতে হবে। কর্নেল ওকে কভার করে থাকো !"

সন্তুকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রাজকুমার। কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না। অসহায় ভাবে বসে রইলেন।

১৬

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন প্রকাশ সরকারের কাছে। মাথার এক জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, প্রকাশ সরকার অজ্ঞান। কাকাবাবু পরে আছেন রাত-পোশাক, সঙ্গে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই। ফ্যাঁস করে তিনি নিজের জামাটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর সেটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন ওর মাথাটা। নাকের কাছে হাত নিয়ে নিশ্বাসটা অনুভব করে দেখলেন। এখন আর কিছু করার নেই তার।

লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এলেন কাকাবাবু। রাগে-দুঃখে তাঁর মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেছে। তাঁর হাতে রিভলভার, অথচ

তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে চলে গেল !

এবারে বাড়ির বাইরে শোনা গেল ভারী ভারী জুতোর শব্দ। কারা যেন ছুটে ছুটে আসছে।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আর ইউ সেইফ, রায়চৌধুরী? নো হার্ম ডান্ ?"

কাকাবাবু একেবারে ফেটে পড়লেন।

"অপদার্থ! ওয়ার্থলেস! তোমাদের সামান্য সেন্স অফ রেসপনসিবিলিটি নেই !"

"আরে শুনো, শুনো। পহ্‌লে তো শুনো !"

"কী শুনব, আমার মাথা আর মুণ্ডু? যা হবার তা তো হয়েই গেছে! তোমাদের আরও আধঘণ্টা আগে আসবার কথা ছিল—"

"গাড়ির অ্যাকসিলেটরের তার কেটে গেল যে! এমন বেওকুফ, সঙ্গে একটা এক্সট্রা তার পর্যন্ত রাখে না। ব্যাস, গাড়ি বন্ধ !"

"গাড়ি বন্ধ? সি আর পি' র গাড়ি খারাপ? এমন গাড়ি রাখে কেন ?"

"বাইরে তো দেখতে নতুন, ভিতরে একদম্ ঝরঝরে। নদীর ধারে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, সেখান থেকে আমরা ডাবল্ মার্চ করে চলে এলাম !"

"আর এসে লাভটা কী হল? ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে !"

"কোন দিকে গেল ?"

"এখন তুমি দৌড়ে দৌড়ে ওদের পেছনে তাড়া করবে? ওদের সঙ্গে ভাল গাড়ি আছে। শোনো, এই লোকটি আহত হয়েছে, ওর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।"

প্রকাশ সরকারের জ্ঞান ফিরে এসেছে এর মধ্যে। আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "কী হল? সবাই পালিয়ে গেল ?"

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওরা সন্তুকে নিয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস লোক ওরা, সন্তু ওদের কাছে একটু চালাকি করতে গেলেই মহাবিপদ

হবে। ওদের মায়াদয়া নেই।”

নরেন্দ্র ভার্মা খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, “কিন্তু রাজা। তোমার হাতে রিভলভার, তবু ঐ লোকগুলো সন্তুকে ধরে নিল কী করে? তুমি রেজিস্ট করলে না?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি কী করব? লোকগুলোকে গুলি করে মারব! আজ খুব একটা শিক্ষা হল। সাধারণ গুণ্ডা—বদমাসরা অনায়াসে মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। আমরা কি ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারি?”

“ওদের কাছেও আর্মস ছিল?”

“এটাও তো ওদেরই। আমি এটা কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারী, তাই কোনো লাভ হল না। আমি কথা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করলাম, খালি ভাবছি তোমরা এসে পড়বে, আর তোমাদের পাত্তাই নেই!”

“গাড়িটা যে এমন বিট্রে করবে, তা কী করে বুঝব বলো! আই অ্যাম ভেরি সরি! ওদের সর্দার কে? চিনতে পারলে?”

“সে সব কথা পরে হবে! এখন এখান থেকে যাব কী করে? পায়ে হেঁটে?”

“এক জনকে ফেরত পাঠিয়েছি। আর একটা গাড়ি নিয়ে আসবে।”

“সে গাড়ি আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি হাঁটব কী করে? আমার ক্রাচ্ নেই। তোমাকে ক্রাচ্ আনতে বলেছিলাম, এনেছ?”

“সেও তো গাড়িতে রয়ে গেছে!”

“বাঃ!”

“রাজা, আর দিমাগ্ খারাপ কোরো না। কোনো উপায় তো নেই। একটু ঠাণ্ডা মাথা করে বোসো!”

এমন সময় নীচ থেকে উঠে এলেন দেববর্মন। কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে বললেন, “মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন?”

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের যা ব্যবস্থার ধাক্কা, তাতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব মনে হচ্ছে।"

"আপনার মাথার গোলমাল···মানে···সেটা সত্যি নয়? একবারও বুঝতে পারিনি!"

"আমার আবার মাথার গোলমাল শুরু হবে এক্ষুনি। সন্তুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে! আপনারা ঐ ছেলেটাকে চেনেন না, ওর দারুণ সাহস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে বেশি সাহস দেখাতে গেলে কী যে হবে ঠিক নেই। ওদের মধ্যে "কর্নেল" বলে একটা লোক আছে, সে দারুণ গোঁয়ার। ঐ দেখুন না, প্রকাশ সরকারের মাথা কী রকম জখম করে দিয়েছে।"

দেববর্মন বললেন, "কর্নেল'? একজন তো কর্নেল আছে, নাম-করা ক্রিমিনাল। জেল ভেঙে পালিয়েছে।"

"আর রাজকুমার বলে কারুকে চেনেন?"

"দেখুন, আমাদের এখানে অনেকেই রাজকুমার। আমি নিজেই তো অন্তত কুড়িজন রাজকুমারকে চিনি।"

নরেন্দ্র ভার্মা চেয়ারটা নিয়ে এসে কাকাবাবুর কাছে রেখে বললেন, "রাজা, তুমি এখানে বোসো। আর কতক্ষণ এক ঠ্যাংকা উপার খাড়া হয়ে থাকবে?"

কাকাবাবু বললেন। "একটা গাড়ি। একটা গাড়ির জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল।"

দেববর্মন বললেন, "আমাদের আর একটু তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। দুটো গাড়ি আনলে কোনো গণ্ডগোল ছিল না। ওদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল। চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারছি। ওরা ডান দিকে গেছে। জঙ্গলের দিকে।"

কাকাবাবু বললেন, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগরতলায় ফিরে যাওয়া দরকার। কাল সকালেই একটা মিটিং ডাকতে হবে।"

এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নরেন্দ্র ভার্মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ঐ তো আমাদের গাড়ি এসে গেল বোধ হয়!"

দেববর্মন বললেন, "আমাদের গাড়ি ? এত তাড়াতাড়ি কী করে আসবে ? একজন লোক আগরতলায় যাবে আবার ফিরে আসবে, এত কম টাইমে তো হবার কথা নয় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে কি ওরাই আবার ফিরে আসছে ? ওদের দলে কত লোক আছে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

১৭

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়িটার সামনে। তার থেকে নামলেন পুলিশের কর্তা শিশির দত্তগুপ্ত।

নরেন্দ্র ভার্মার দোতলার সিঁড়ির কাছে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিশির দত্তগুপ্তকে দেখে বললেন, "আমাদেরই লোক ! কী আশ্চর্য, আপনি ?"

টকটক করে জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শিশিরবাবু বললেন, "আপনাদের গাড়িটা মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে আছে দেখলাম ! আপনারা ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পেরেছিলেন ? ওরা ধরা পড়েছে তো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, আমরা বহুত দেরি করে ফেলেছি। সব ব্যাটারা ভেগেছে। সন্তুকে পাকাড়কে লিয়ে গেছে। কিন্তু আপনার তো শরীর খুব খারাপ। একশো পাঁচ ফিভার হয়েছে শুনলাম !"

দেববর্মন বললেন, "আপনার স্ত্রী বললেন, আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে—"

শিশিরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমার হাই ফিভার হয়েছিল, তাই আপনাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। কিন্তু থাকতে পারলাম না। এখনো জ্বর আছে, যাক গে, সে এমন কিছু নয়, এখানে কী হল বলুন !"

কাকাবাবু দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন,

"সে সব কথা পরে হবে। এখানে একজন ইনজিওরড হয়ে আছে, আগে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।"

শিশির দত্তগুপ্তও কাকাবাবুকে সুস্থ মানুষের মতন কথা বলতে শুনে নরেন্দ্র ভার্মার মতন খুব অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি তা হলে—"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এখন সুস্থ হয়ে গেছি। চলুন, আগরতলায় ফেরা যাক্।"

প্রকাশ সরকার এগিয়ে এসে বললেন, "আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার ইনজুরি মারাত্মক কিছু না।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে আর থাকবার কোনো দরকার নেই।"

কাকাবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করলেন।

শিশিরবাবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বসলেন, "আমি ধরছি। আপনি আমার কাঁধে ভর দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনো দরকার নেই। আমার অসুবিধে হচ্ছে না।"

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেল? ওরা কতজন এসেছিল বলুন তো?"

"পাঁচ-ছ'জন হবে। তার মধ্যে একজনের নাম রাজকুমার, বেশ লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য, নস্যিরঙের স্যুট পরা। আর একজনকে ওরা কর্নেল বলে ডাকছিল।"

"কর্নেল? ওর চেহারাটা কী রকম বলুন তো? মুখখানা বুলডগের মতন?"

"তা খানিকটা মিল আছে বটে। নাকটা থ্যাবড়া। মনে হয় নাকের ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেছে!"

"সে তো একজন সাঙ্ঘাতিক খুনি! টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। কিন্তু···কিন্তু··· ঐ রকম একজন ভাড়াটে খুনি আপনাকে মারতে আসবে কেন? আপনার ওপর কার এত রাগ থাকতে পারে?"

"কার রাগ আছে, তা আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে, কারুর কারুর কাছে আমি খুব দামি হয়ে গেছি। যে-কোনো উপায়ে তারা আমার মাথাটা চায়।"

"আপনার মাথা?"

"হ্যাঁ। কাটা মুণ্ডু নয়। জ্যান্ত মাথা। কেন জানেন। আমি কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় এসে এক জায়গায় একটা খুব পুরোনো মুদ্রা খুঁজে পেয়েছিলাম। রাজা মুকুট-মানিক্যের মুদ্রা, তাতে একটা ঈগল পাখির ছবি আঁকা। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রায় সিংহের মূর্তি থাকত, শুধু ঐ একজনের মুদ্রাতেই ঈগলের ছবি ছিল। সেই জন্যই ঐ মুদ্রা খুব দুর্লভ আর দামি।"

"হ্যাঁ, এ-রকম একটা মুদ্রা আবিষ্কারের কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে। আপনিই সেই লোক? আপনি আগে ত্রিপুরায় এসেছিলেন?"

"অনেকবার। তবে বে-সরকারি ভাবে। সেইজন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কি ত্রিপুরার লোক?"

"আমাদের পুর্বপুরুষরা ত্রিপুরাতেই ছিলেন বটে, তবে আমার জন্ম কুমিল্লায়। সেইখানেই পড়াশুনো করেছি।"

"অমরমানিক্যের গুপ্তধনের কথা শুনেছেন?"

"রাজা অমরমাণিক্যের গুপ্তধন? সে তো একটা গুজব! সে-রকম কিছু আবার আছে নাকি?"

"আছে কি না তা আমিও জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে কারুর কারুর বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমি অমরমাণিক্যের জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনে ফেলেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গুপ্তধন, মানে হিড্‌ন ট্রেজার? এই যুগে? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

শিশিরবাবুও হেসে বললেন, "আমারও ধারণা, এসব একেবারে বাজে কথা। ঐ গুপ্তধনের গুজব এখানে অনেকদিন ধরেই চালু আছে! এ-সম্পর্কে দেববর্মন ভাল বলতে পারবেন।"

দেববর্মন বললেন, "রাজা অমরমাণিক্য সম্পর্কে অনেক রকম গল্প

আছে, গান আছে। তাঁর ঐ গুপ্তধনের কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করে। এখনো কেউ কেউ ঐ গুপ্তধনের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।"

প্রকাশ সরকার বললেন, "ত্রিপুরায় আমার মামার বাড়ি। ছোটবেলায় আমিও এই গুজবের কথা শুনেছি।"

কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন ওঁরা। শিশিরবাবুর জিপগাড়িটার হেডলাইট দুটো জ্বালানো রয়েছে। রাত্রির অন্ধকার চিরে সেই আলোর রেখা চলে গেছে অনেক দূরে।

দেববর্মন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ড্রাইভার কোথায়?"

শিশিরবাবু বললেন, "ড্রাইভার আনিনি। আমার অসুখ বলে আমার ড্রাইভার রাত্রে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এলাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত হাই ফিভার নিয়ে, এই রাত্তিরে জঙ্গলের রাস্তায় একা একা এলেন, না, না, এটা আপনার বিলকুল অন্যায় হয়েছে।"

শিশিরবাবু বললেন, "কী করব! মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেছে শুনে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলাম। আমরাই এরিয়ার মধ্যে এইরকম কাণ্ড। তাই আর থাকতে পারলাম না।"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে দৃঢ় স্বরে শিশিরবাবু বললেন, "আপনার ভাইপোকে আমি কালকের মধ্যেই খুঁজে বার করব। ত্রিপুরা ছোট জায়গা। যাবে কোথায়!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই কোঠিটা কার? জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম একটা ফাঁকা কোঠি পড়ে আছে?"

দেববর্মন বললেন, "সেটা জানা শক্ত হবে না। সকালেই বার করে ফেলব। তবে ত্রিপুরায় এ-রকম বাড়ি অনেক পাবেন। রাজপরিবারের লোকরা জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন অনেক জায়গায়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে গাড়িতে উঠতে একটু সাহায্য করতে হবে।"

নরেন্দ্র ভার্মা আর দেববর্মন দু'দিক থেকে ধরে কাকাবাবুকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

সবাই গাড়িতে ওঠবার পর স্টার্ট দিলেন শিশিরবাবু।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি ত্রিপুরার হিস্ট্রি ঠিক জানি না। এই রাজা অমরমানিক কোন্ টাইমের? ইনি কোথায় গুপ্তধন রেখেছিলেন?"

দেববর্মন বললেন, "অমরমানিক নয়, অমরমাণিক্য। ত্রিপুরায় সব রাজাদের নামই মাণিক্য দিয়ে হত। এমন কী অন্য কোনো লোক রাজাকে মেরে রাজা হয়ে বসলেও তিনি কিছু-একটা মাণিক্য হয়ে যেতেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, এই অমরমাণিক্যের হিস্ট্রিটা আমায় একটু শোনাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ নয়, কাল। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই। সারা রাত জেগে থাকলে কাল সকালে আর কিছু চিন্তা করতে পারব না!"

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কী জানি সন্তুকে নিয়ে ওরা কী করছে!"

১৮

চায়ে চুমুক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "গুপ্তধনে আমার আগ্রহ নেই। এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও কোথাও হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সে সবই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি হওয়া উচিত। আমি ত্রিপুরায় কয়েকবার এসেছি মুদ্রার খোঁজে। আপনারা সবাই জানেন, ইতিহাস চর্চার জন্য প্রাচীন কালের মুদ্রার দাম। এই দাম মানে বাজারের দাম নয়। ইতিহাসের দাম। ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজা রত্নমাণিক্যের আগেকার কোনো রাজার নামের কয়েন পাওয়া যায়নি। আমি খুঁজছিলাম তাঁর আগেকার কোনো রাজার, অর্থাৎ ফিফটিন্থ সেনচুরির আগেকার কোনো রাজার কয়েন উদ্ধার করতে।"

কাকাবাবুর ঘরে সকালবেলাতেই এসে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর শিশির দত্তগুপ্ত। শিশিরবাবুর চোখ লাল, গায়ে এখনো জ্বর আছে, তবু তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি।

শিশিরবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি যে ঈগল আঁকা মুদ্রা খুঁজে পেয়েছেন। সেটা কোন সময়কার ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক ঈগল কি না বলা যায় না। তবে ঐ রকমই একটা পাখি আঁকা। সেটা মুকুটমাণিক্য নামে এক রাজার সময়কার। তাঁর মুদ্রায় সিংহের বদলে কেন ঈগল পাখির ছবি, সেটা একটা রহস্য। অবশ্য সেই সময় ত্রিপুরার ইতিহাসে খুব খুনোখুনির পালা চলেছিল। প্রায়ই একজন রাজাকে তার সেনাপতি খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসত। আবার আগেকার সেই রাজার কোনো ভাই বা ছেলে সেই সেনাপতিকে খুন করে সিংহাসন ফিরিয়ে আনত। ঈগল পাখি আঁকা মুদ্রা ছাড়া আমি আরও কয়েকটা মুদ্রাও পেয়েছি। সেগুলো কোন্ সময়কার তা এখনো জানা যায়নি। যাই হোক, আমার ঐ মুদ্রা আবিষ্কারের কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। যদিও এ কথা প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেই খবর পড়েই কাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।"

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মুদ্রা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "পেয়েছিলাম জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে। লোকে সেটাকেই জঙ্গলগড় বলে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন। "অমরমাণিক্যের গুপ্ত্ধনের কাহানিটা কী আমি একটু শুনতে চাই।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে একটু আগে থেকে শুরু করি। দিল্লীতে যখন আকবর বাদশা রাজত্ব করছেন, তখন ত্রিপুরায় রাজা ছিলেন বিজয়মাণিক্য। তাঁর ছেলের নাম অনন্তমাণিক্য। রাজা বিজয়মাণিক্য তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি গোপীপ্রসাদের মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিশ্বাসী সেনাপতিটি কিন্তু চমৎকার

বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। অনন্তমাণিক্য রাজা হবার দু' বছরের মধ্যেই গোপীপ্রসাদ তাকে খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসল!"

শিশিরবাবু বললেন, "সেনাপতিকে আপনি দোষ দিতে পারেন না! জোর যার সিংহাসন তার, এই ছিল তখনকার নিয়ম।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে নিজের জামাইকে খুন করে, নিজের মেয়েকে বিধবা করে রাজা হওয়াটাকে ভাল বলব? বলুন?"

শিশিরবাবু আর কিছু না বলে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, "এই গোপীপ্রসাদ রাজা হয়েই নাম নিয়ে নিল উদয়মাণিক্য। তার রাজধানী রাঙামাটির নাম বদলে দিয়ে নিজের নামে নাম রাখল উদয়পুর। এই উদয়মাণিক্য আর তার রানি হিরা দাপটে রাজত্ব করতে লাগল কিছুদিন। কিন্তু বেশিদিন সুখ ভোগ করতে পারল না। কোনো একটি মেয়ে ঐ রাজা উদয়মাণিক্যকে বিষ খাইয়ে দেয়। অনেকে বলে তার বিধবা মেয়েই নাকি বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। তখন রাজা হল উদয়মাণিক্যের ছেলে জয়মাণিক্য!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে রয়াল থ্রোন সেনাপতিদের ফ্যামিলিতেই চলে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আগেকার রাজা বিজয়মাণিক্যের এক ভাই ছিলেন অমরমাণিক্য নামে। গোপীপ্রসাদের অত্যাচারে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। জয়মাণিক্য রাজা হবার পর সেই অমরমাণিক্য এসে চ্যালেঞ্জ জানালেন তাকে। লড়াইতে তিনি জয়মাণিক্যকে পরাজিত ও নিহত করলেন। আবার সিংহাসন এসে গেল রাজপরিবারে। এই অমরমাণিক্য ছিলেন সেকালের ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "লেকিন রাজা হয়ে তিনি গুপ্তধন রাখবেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, সে কথা বলছি। রাজা অমরমাণিক্য

অনেকদিন গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন, প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যেও সুখ সইল না বেশি দিন।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "আবার সেনাপতি এসে মারল তাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, তা নয়। অমরমাণিক্য সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেনাপতিকে তিনি বেশি বিশ্বাস করতেন না, তাকে বেশি ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তার ফলও ভাল হয়নি। হঠাৎ আরাকানের রাজা সিকান্দার শাহ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল ত্রিপুরা। অমরমাণিক্য এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না তখন। তিনি যুদ্ধে হারতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত আরাকানের মগ সৈন্যরা যখন এসে পড়ল রাজধানী উদয়পুরের দোরগোড়ায়, তখন অমরমাণিক্য ধরা না দিয়ে পালিয়ে গেলেন সপরিবারে। মগ সৈন্য এসে উদয়পুরে লুঠতরাজ করে একেবারে তছনছ করে দিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এবার বললেন, "তারপর? তারপর? রাজা ধরা পড়ে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "না। রাজা অমরমাণিক্য লুকিয়ে রইলেন তিতাইয়ার জঙ্গলে। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরও গিয়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে চারদিকে দেয়াল গেঁথে একটা ছোট দুর্গের মতনও বানিয়ে ফেললেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ওহি হ্যায় জঙ্গলগড়?"

"লোকে তাই বলে। এখন আর গড়ের চিহ্ন বিশেষ নেই, কয়েকটা দেয়াল আর দু' একটা ভাঙা ঘর মাত্র রয়েছে। আরাকান রাজার সৈন্যরা ওদের সন্ধান পায়নি, কিন্তু রাজা অমরমাণিক্য হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেললেন।"

শিশির দত্তগুপ্ত মুখ তুলে বললেন, "রাজা কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করে বসলেন!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি এই ইতিহাস জানেন দেখছি!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "এই ঘটনা সবাই জানে। রাজা অমরমাণিক্য বিষ খেয়েছিলেন। ত্রিপুরার আর কোনো রাজা এরকম কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করেননি।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা ঠিক কাপুরুষতা বলা যায় না। রাজা অমরমাণিক্যের আত্মসম্মান জ্ঞান দিল খুব বেশি। তিনি তো দুর্বল রাজা ছিলেন না। নিজের ক্ষমতায় সিংহাসন দখল করেছিলেন। আরাকান রাজার কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ একদিন আত্মহত্যা করলেন।"

"ওঁর ধনসম্পদ সব ঐ জঙ্গলগড়েই রয়ে গেল?"

"অনেকে তাই বিশ্বাস করে। রাজধানী থেকে পালিয়ে আসবার সময় তিনি নিশ্চয়ই অনেক ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। সেসব গেল কোথায়? অমরমাণিক্য হঠাৎ মারা যান, তাঁর ধনসম্পদ কোথায় লুকনো আছে, সে কথা কারুকে বলে যাননি। সেই থেকেই গুপ্তধনের গুজবের জন্ম। এই গুপ্তধনের দাবিদার শুধু রাজপরিবার নয়। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের বংশধররাও মনে করে সেই গুপ্তধনে তাদেরও ভাগ আছে। এই নিয়ে দুই পরিবারে মারামারিও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কিছু খুঁজে পায়নি।"

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, "আভি তো কই রাজাও নেই, সেনাপতিও নেই। এখন আর কে লড়ালড়ি করবে?"

কাকাবাবু বললেন, "রাজা নেই, সেনাপতি নেই বটে, কিন্তু তাদের বংশধররা আছেন। সেই সব বংশের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কার মনের ভাব কী তা কে জানে? যে লোকটি কাল রাতে নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দিচ্ছিল! সে তো বলল, ঐ গুপ্তধনের ওপরে তারই সম্পূর্ণ অধিকার।"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ঐ রকম রাজকুমার অনেক আছে! সত্যিকারের রাজবংশের কোনো ছেলে কি সাধারণ গুণ্ডার মতন ব্যবহার করতে পারে? কক্ষনো না!"

কাকাবাবু বললেন, "আর একটা ব্যাপার আছে। কাল নরেন্দ্র ভার্মার আসতে যখন দেরি হচ্ছিল, তখন সময় নেবার জন্য আমি বলেছিলুম, ঠিক আছে, জঙ্গলগড়ের সন্ধান আমি দিতে পারি, কিন্তু আমায় কত টাকা বখরা দেবে বলো। তখন রাজকুমার বললে, "রায়চৌধুরী, তোমাকে আগেই অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তুমি রাজি হওনি!' কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই, এর আগে তো আমায় কেউ এ ব্যাপারে কোনো টাকা দেবার প্রস্তাব করেনি! তার মানে, ঐ রাজকুমার ঠিক জানে না। সে প্রধান দলপতি নয়। আর কেউ আছে।"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ধরে ফেলব, সবাইকেই ধরে ফেলব। ঐ রাজকুমার আর কর্নেল, ওদের সবাইকেই কালকের মধ্যে আপনার সামনে হাজির করে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে সন্তুকে উদ্ধার করার কী ব্যবস্থা করবেন?"

এই সময়ে সিঁড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। শিশির দত্তগুপ্ত আর নরেন্দ্র ভার্মা সেই শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াতেই সাদা পোশাকের পুলিশ দু'জন একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।"

ওদের একজন বলল, "স্যার, এই লোকটা একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা ছাড়িনি।"

১৯

রাজকুমার বজ্রমুষ্টিতে সন্তুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে এনে তুলল একটা জিপ গাড়িতে। নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে মাঝখানে বসাল সন্তুকে। আর পাশে খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে বসল 'কর্নেল'।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর রাজকুমার বলল, "কেউ আমাদের ফলো করলে সোজা গুলি চালাবে। আমরা কিছুতেই ধরা দেব না।"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "কোনো রকম

চালাকির চেষ্টা কোরো না, খোকা। প্রথমেই প্রাণে মারব না তোমায়! আমার লোকদের বলা আছে, তুমি পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবে, দ্বিতীয়বারে একটা হাত কেটে দেবে। সারা জীবন ল্যাংড়া আর নুলো হয়ে থাকতে হবে, মনে রেখো!"

সন্তু কোনো কথা বলল না। কাকাবাবু যে পাগল হয়ে যাননি, এমনকি তাঁর যে পক্ষাঘাতও হয়নি, এই আনন্দেই সে আর কোনো বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। এই ডাকাতরা কাকাবাবুর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা যে সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য সন্তুর একটুও ভয় নেই।

অন্য লোকগুলো আসছে পেছনের একটা গাড়িতে। হেডলাইটের আলোয় সন্তু দেখতে পাচ্ছে, সামনে কোনো রাস্তা নেই। এখানে জঙ্গল সে-রকম ঘন নয়। আলাদা আলাদা বড় বড় গাছ, জিপটা চলছে এরই ফাঁক দিয়ে এঁকে বেঁকে।

আন্দাজ প্রায় আধঘণ্টা চলার পর সন্তু দেখল সামনে একটা নদী। প্রথমে মনে হয়েছিল জিপটা একেবারে নদীতেই নেমে পড়বে। কিন্তু খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে রাজকুমার সেটা থামাল একেবারে জলের কিনারে।

রাজকুমার বলল, "কর্নেল, ওকে তোমার ঘোড়ায় তোলো!"

সত্যি সেখানে গোটা পাঁচেক ঘোড়া বাঁধা আছে। বড় ঘোড়া নয়, ছোট ছোট পাহাড়ি টাট্টুঘোড়ার মতন। সন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এই রকম ঘোড়া দেখেছে।

'কর্নেল' প্রথমে সন্তুকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর নিজেও সেই ঘোড়াটায় চেপে বসল। রাজকুমার বসল তার পাশের ঘোড়ায়। তারপর অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, "তোমাদের মধ্যে দু'জন জিপ দুটো নিয়ে চলে যাও। বাকিরা এসো আমাদের সঙ্গে।"

সন্তুদের ঘোড়াটা প্রথমে কিছুতেই জলে নামতে চায় না। 'কর্নেল' তার দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে বারবার খোঁচা মারতে লাগল তার

তলপেটে। তারপর ঘোড়াটা হঠাৎ হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

সন্তু আগে কখনো এভাবে নদী পার হয়নি। সিনেমাতে সে এরকম দৃশ্য কয়েকবার দেখেছে। সে সব ওয়েস্টার্ন ছবি। এই দেশেও যে কেউ ঘোড়ার পিঠে নদী পার হয়, তা তার ধারণাতেই ছিল না। তার দারুণ উত্তেজনা লাগছে।

নদীটাতে জল বেশি নয়, তবে বেশ স্রোত আছে। সন্তুর কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে গেল। সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। একবার তার লোভ হল 'কর্নেল'-কে এক ধাক্কা দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ডুব সাঁতার দিয়ে সে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে। জলের মধ্যে ওরা গুলি করলেও তার গায়ে লাগবে না।

কিন্তু সন্তু সেই লোভ সংবরণ করল। সে ভাবল, দেখাই যাক না এরা কোথায় তাকে নিয়ে যায়। এদের আস্তানাটা তার চেনা দরকার।

নদী পেরিয়ে অন্য পারে পৌঁছোবার পর ঘোড়া চলতে লাগল তুলকি চালে। মাঝে-মাঝে ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিচ্ছে আর তখন তার গা থেকে বৃষ্টির মতন জলের কণা উড়ছে। সেই সময় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই মুশকিল!

সন্তুর সারা শরীর জবজবে ভিজে। তার একটু-একটু শীত করছে। আকাশে এখন পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে, তাতে চারদিকটা বেশ দেখা যায়। এদিকে আর জঙ্গল প্রায় নেই। উঁচু নিচু পাহাড়ি জায়গা। সন্তুর মনে হল, ঠিক যেন টেক্সাস কিংবা আরিজোনার কোনো প্রান্তর দিয়ে চলেছে তাদের ঘোড়া।

একটা ছোট টিলার ওপর উঠে একটা পাথরের বাড়ির সামনে থামল ঘোড়াগুলো। টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। রাজকুমার সেই বাড়িটার সামনের লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বললো, "আসছি, আসছি!"

বাড়িটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এবারে তার একটা ঘরে জ্বলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো। তারপর সেই লণ্ঠনটা দোলাতে দোলাতে

একজন লোক এল গেটের কাছে। লণ্ঠনটা উঁচু করতেই দেখা গেল তার মুখ। ঠিক যেন একটা গোরিলা।

লোকটি বলল, "এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?"

রাজকুমার বলল, "মেজর, এই একটা ছোঁড়াকে এনেছি, একে কিছু-দিন তোমার জিম্মায় রাখতে হবে।"

'মেজর' লণ্ঠনটা সন্তুর মুখের কাছে এনে বলল, "এতো দেখছি একটা দুধের ছেলে। একে এনে কী লাভ হল? ধাড়িটা কোথায়?"

রাজকুমার বলল, "আসবে, আসবে, সেও আসবে। কান টানলেই মাথা আসে। এই ছোঁড়াটাকে এখন দোতলার কোণের ঘরে রাখো। দুধের ছেলে বলে হেলাফেলা কোরো না। এ মহা বিচ্ছু। একটু আলগা দিলেই পালাবার চেষ্টা করবে।

'কর্নেল' বলল, "রাজকুমার, এবার তা হলে আমি যাই?"

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল, "যাবে মানে? কোথায় যাবে?"

'কর্নেল' বলল, "আমি আর থেকে কী করব? আমার তো এক রাত্তির ফ্রি সার্ভিস দেবার কথা ছিল। হাওয়া খুব গরম, আমি আর ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।"

রাজকুমার 'কর্নেলের' মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, "তোমার নামে যে কেস ঝুলছে, তাতে তোমার নির্ঘাৎ ফাঁসি হবে তা জানো?"

'কর্নেল' বলল, "সেইজন্যই তো আর আমি একদিনও ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।"

রাজকুমার বলল, "তুমি না চাইলেই কি ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া যাবেই বা কোথায়? আসাম, পশ্চিম বাংলা এই দু' জায়গাতেই তোমার নামে হুলিয়া ঝুলছে।"

'কর্নেল' বলল, "সে কোথায় যাব, তা আমি ঠিক বুঝে নেব।"

রাজকুমার বলল, "তোমার মাথায় যা ঘিলু আছে, তাতে তুমি কিছুই বুঝবে না।"

কর্নেল এবার রেগে উঠে বলল, "কেন আমায় আবার এসব ঝুট-

ঝামেলায় জড়াচ্ছেন ? এমনিতেই আমি মরছি নিজের জ্বালায়… আজ রাত্তিরে আমি সার্ভিস দিয়েছি, আর কিছু পারব না !”

রাজকুমার বলল, “ওরে গাধা ! একমাত্র ত্রিপুরাতেই তুই নিরাপদ। এখানে আর কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না। তোর নামে এখানে যে কেস ছিল, তা আমি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছি।”

‘কর্নেল’ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “সত্যি বলছেন ? নাকি আমায় চুপ্‌কি দিচ্ছেন ?”

‘মেজর’ এবার বলল, “ও কর্নেলদাদা, রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক কোরো না, উনি যা বলছেন, মেনে নাও ! ত্রিপুরা পুলিশ তোমায় আর কিছু বলবে না।”

রাজকুমার এবার মেজরের দিকে ফিরে বলল, “এ কী, তুমি এখনো যাওনি ? ছোঁড়াটাকে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছ, ও সব শুনছে ? যাও !”

“মেজর’ এবার সন্তুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সন্তু শুনল, কর্নেলের একজন সঙ্গী বলছে, “রাজকুমার, তা হলে আমার কেসটাও তুলে নেওয়া হবে তো ?”

সন্তু অবশ্য এই সব কথার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। কেস কী ? এদের নামে কিসের কেস ? রাজকুমার নিজেই তো একটা ডাকাত, সে ওদের নামে পুলিশ কেস তুলে নেবে কী করে ?”

ঘোরানো একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে ‘মেজর’ থামল একটা ঘরের সামনে। দরজাটা খুলে সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়ে-টেয়ে এসেছ তো, নাকি এত রাত্তিতে খাবার দিতে হবে ?”

সন্তু বলল, “না, খাবার চাই না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? তোমার নাম ‘মেজর’ কেন ? তুমি কি মিলিটারির লোক ?”

লোকটি হা-হা করে হেসে উঠে বলল, “ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে খোকা ? সাধ করে এই বিপদের মধ্যে এসেছ কেন ? তোমার ইস্কুল খোলা নেই এখন ?”

সন্তু বলল, “আমি কলেজে পড়ি।”

মেজর বলল, "বাঃ ! তবে তো আর এক কাঠি ! পড়াশুনো ছেড়ে এখানে মরতে এসেছ কেন ?"

সন্তু বেশ স্মার্টলি বলল, "আর বেশিদিন থাকব না, কাল-পরশুই ফিরে যাব ভাবছি !

'মেজর' ভুরু তুলে বলল, "তাই নাকি ? কাল-পরশু ? এত তাড়াতাড়ি ? হা-হা-হা-হা !"

লোকটির মুখের চেহারা গেরিলার মতন হলেও কথাবার্তা কিংবা হাসিটা তেমন নিষ্ঠুর নয়। বরং বেশ যেন মজাদার লোক বলে মনে হয়। হাসির সময় তার মুখের মস্ত গোঁফটা নাচে।

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়ে সে বলল, "এসো খোকাবাবু, ছাখো, আমাদের অতিথিশালাটি তোমার পছন্দ হয় কি না ! এসো, এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

লোকটি সন্তুর হাত ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। ওর হাতে কোনো অস্ত্রও নেই। গোটা বাড়িটা অন্ধকার, এখন ইচ্ছে করলেই সন্তু এক ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তু বুঝতে পারল, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নীচে অন্য সবাই রয়েছে, শিকারি কুকুরের মতন তাড়া করে ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

সন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এ ঘরে কোনো খাট, চেয়ার টেবিল নেই। মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বিছানা মানে শুধু একটা কম্বল আর বালিশ। আর একটা জলের কুঁজো।

'মেজর' বলল, "কাল সকালে তোমায় গরম দুধ খাওয়াব। দেখো, এখানকার দুধের স্বাদ কত ভালো। তুমি খরগোশ খেতে ভালবাসো ? আজ একটা খরগোশ ধরেছি, সেটাকে রান্না করব কাল। তুমি রুটি খাও, না ভাত খাও ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এটা কি হোটেল ?"

'মেজর' অকারণে আবার হেসে উঠল। তারপর গোঁফ মুছে বলল, "শোনো বাপু, আগেভাগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি। তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছ নিশ্চয়ই ? আমিও অনেক পড়েছি।

সব বইতেই দেখেছি, তোমার বয়েসি ছেলেরা একবার না একবার পালাবার চেষ্টা করেই। তুমিও করবে নিশ্চয়ই। তোমার সবে ডানা গজাচ্ছে, এই তো পালাবার বয়েস! কিন্তু তুমি যদি পালাও, তাহলে আমার যে গর্দান যাবে! সুতরাং তুমি পালাবার চেষ্টা করলে আমিও তোমাকে ধরতে বাধ্য। তারপর ধরা যখন পড়বে, তখন তোমায় শাস্তিও দিতে হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে খেতে না দেওয়া। তুমি যদি কাল দুপুরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু খরগোশের মাংস তোমায় দেব না, বুঝলে?"

সন্তু বলল, "আমি খরগোশের মাংস খেতে চাই না।"

'মেজর' বলল, "যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। আজ রাতে অনেক ধকল গেছে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়ো!"

দরজার সামনে থেকে রাজকুমার ঠিক তক্ষুনি বলল, "দাঁড়াও, এখন ঘুমোবে কী, ওকে এখন চিঠি লিখতে হবে।"

২০

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার 'মেজর'-কে বলল, "যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এসো!"

'মেজর' যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড়-বড় করে বলল, কাগজ? কলম? সে আমি পাব কোথায়?"

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন, তোমার কাছে কাগজ-কলম নেই? জোগাড় করে রাখোনি কেন?"

'মেজর' হে-হে করে হেসে বলল, "কী যে বলেন, রাজকুমার! আমরা যে-কাজ করি, তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয়? আপনি আগে তো জোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি।"

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ানো 'কর্নেল' আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কারুর কাছে কলম আছে?"

'কর্নেল' কোনো উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেইনি। অন্যরাও কেউ কোনো কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে 'মেজর'-কে বলল, "তুমি অন্য ঘর-গুলিতে খুঁজে দেখে এসো!"

'মেজর' বলল "আমি তিন দিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘর ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি!"

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে বলল, "সামান্য কাগজ-কলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে? এখন সময়ের কত দাম জানো? যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারোনি"?

'মেজর' বলল, "পাশের ঘরে একটা পুরনো ক্যালেণ্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে?"

'কর্নেল' বলল, "আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।"

এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল।

রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, "গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায়? কালি কোথায় পাওয়া যাবে?"

'কর্নেল' বলল, "কাঠকয়লা নেই বাড়িতে? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বানানো যায়।"

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, "তবে যাও! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে নিয়ে এসো!"

'মেজর' আর 'কর্নেল' দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কট্‌মট করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্‌ পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চ্যাচামেচি করছে, সে-ও

তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সে-ও পকেটে একটা কলম রাখে না ? এতেই বোঝা যায়, এরা কী রকম ধরনের মানুষ !

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দিল। তারপর জানলার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কি না।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্ দেখিয়েছ ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই !"

সন্তু কোনো উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই 'মেজর' আর 'কর্নেল' ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। 'মেজর' নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেণ্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, "নাও, এবারে লেখো !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে লিখতে হবে ? প্রধানমন্ত্রীকে ?"

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে ? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি লেখো। আমি যা বলছি, তাই লিখবে !"

সন্তু প্রথমে লিখল। "পূজনীয় কাকাবাবু। তারপর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাল।"

রাজকুমার বলল, "লেখো। আমি বেশ ভাল আছি।"

সেই ক্লাস টু-থ্রি তে পড়ার সময় সন্তু ডিকটেশান লিখেছে, তারপর আর কারুর কথা শুনে শুনে তাকে চিঠি লিখতে হয়নি। যাই হোক, রাজকুমারের এই কথাটায় আপত্তির কিছু নেই বলে সে লিখে ফেললো।

রাজকুমার বলল, "তারপর লেখো, এখনও পর্যন্ত ইহারা আমার উপর কোনো অত্যাচার করে নাই।"

সন্তু বলল, "আমি সাধু ভাষা লিখি না। আমি চলতি ভাষায় চিঠি লিখি।"

রাজকুমার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "যা বলছি, তাই লেখো!"

সন্তু লিখল, "এখনও পর্যন্ত এরা আমার ওপর কোনো অত্যাচার করেনি।"

'কর্নেল', 'মেজর' ও অন্য দু'জন সন্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল সন্তুর চিঠি লেখা।

রাজকুমার বলল, "হয়েছে? এবারে লেখো, তবে, আপনার উপরেই আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের সন্ধান ইহাদের না দিলে ইহারা আর আমায় জীবন্ত ফিরিয়া যাইতে দিবে না!"

সন্তু বলল, "একথা আমি লিখব না!"

রাজকুমার বলল, "লিখব না মানে? তোর ঘাড় ধরে লেখাব। হতচ্ছাড়া, যা বলছি তাই লেখ্ শিগগির!'

সন্তু বলল, "আমায় দিয়ে জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারবে না।"

রাজকুমার বলল, "তবে রে? আচ্ছা, গ্যাখ একটুখানি নমুনা। কর্নেল, ওর বাঁ হাতে একটু অপারেশান করে দাও তো।"

'কর্নেল' অমনি খপ্ করে সন্তুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর তার ছুরিটা সন্তুর কনুইয়ের খানিকটা নীচে একবার ছুঁইয়ে দিল শুধু। মনে হল ঠিক যেন পালক বুলিয়ে গেল একটা। তবু সেই জায়গাটায় একটা লম্বা রেখায় ফুটে উঠলো রক্ত। টপ্ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল ক্যালেণ্ডারের পাতাটার ওপর।

রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, "এইবার দেখলি? লেখ্ যে, এই রক্তের ফোঁটাটা আমার। কাকাবাবু, আপনি আমার কথা না শুনিলে ইহারা আমার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবে। তারপর সেই রক্তে আমার জামা কাপড় চুবাইয়া তাহা আপনার নিকট পাঠাইবে।"

সন্তু বলল, "এ রকম বিচ্ছিরি ভাষা আমি কিছুতেই লিখব না। আমাকে মেরে ফেললেও না।"

রাজকুমার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে উল্টো করে ধরল। ওর বাঁট দিয়ে সন্তুর মাথায় মারতে চায়।

কিন্তু সে মারবার আগেই 'মেজর' হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "রাজকুমার, একটা কথা বলব? আমি একটু একটু লেখাপড়া করেছি। গুম-খুনের কিছু বইও পড়েছি। এই রকম সময় কী রকম চিঠি লিখতে হয়, তা খানিকটা জানি। আমি ওকে বলে দেব?"

রাজকুমার বলল, "তুমি কী রকম লেখাতে চাও, শুনি!"

'মেজর' বলল, "যেটুকু লেখা হয়েছে, তারপর লিখুক, কাকাবাবু, আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের জায়গাটার একটা নকশা এঁকে যদি এদের কাছে পাঠান, তবেই এরা আমাকে ছাড়বে বলেছে। তবে এ সম্পর্কে আপনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—।"

সন্তুর দিকে ফিরে 'মেজর' বলল, ছ্যাখো ভাই, চিঠি তো তোমায় একটা লিখতেই হবে। নইলে আমরা তোমায় ছাড়ব না। শুধু শুধু কেন মারধোর খাবে? আমি যা বললুম, তা লিখতে তোমার কি আপত্তি আছে?"

কথা বলতে বলতে সকলের অলক্ষিতে 'মেজর' সন্তুর দিকে একবার চোখ টিপে দিল। যেন সে বলতে চাইল, এই কথাগুলো লিখতে রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

গাছের ডালের কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে সন্তু লিখে দিল এই কথাগুলো।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী, তোমার এই হাতের লেখা দেখে চিনতে পারবে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, আমার সই দেখে ঠিক চিনবেন।"

রাজকুমার বলল, "পুনশ্চ দিয়ে আবার লেখো, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর চাই।"

সন্তু বলল, "আর আমি কিছু লিখতে পারব না।"

'মেজর' বলল, "দিন, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের

লেখা কেউ চিনতে পারবে না, আমি সাত-আট রকম ভাবে লিখতে পারি।

'মেজর' সন্তুর চিঠির নীচে লিখল, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর আর নকশা না পেলে সব শেষ। তোমার ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবর দিলে কোনো লাভ হবে না।"

এর নীচে সে আবার একটা মড়ার মাথার খুলি এঁকে দিল।

রাজকুমার আবার চিঠিখানা নিয়ে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল। "ঠিক আছে। এটাই পাঠিয়ে দাও! 'কর্নেল' তোমার একজন লোককে বলো ঘোড়া নিয়ে আগরতলায় চলে যেতে, ভোরের আগেই যেন পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জেনারেলই চিঠি ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করবেন!"

'কর্নেল' বলল, "কিন্তু আমার লোক যদি রাস্তায় ধরা পড়ে যায়?"

রাজকুমার হুংকার দিয়ে বলল, "কে ধরবে? কেউ ধরবে না, যাও! ধরা পড়লেও চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গায়। আর যে ধরা পড়বে, তাকে আমি একদিন পরেই ছাড়িয়ে আনব। আমি রাজকুমার, ভুলে যেও না!"

এরপর রাজকুমার সদলবলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্তুকে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সন্তু আর সে দরজা টানাটানির চেষ্টা করল না।

সে এসে দাঁড়াল খোলা জানলার ধারে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গেটের কাছে ঘোড়ার ক্ষুর ঠোকার আর বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক জোনাকি। টি ট্টি টি ট্টি করে দূরে একটা রাত পাখি ডাকছে। এরই মধ্যে কপাকপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া ছুটে চলে গেল।

যদিও কাছেই বিছানা পাতা, কিন্তু সন্তু বসে পড়ল ঐ জানলার পাশেই। তারপর জানলার শিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। সকাল হয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়াতেও তার ঘুম ভাঙল না।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই সন্তু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

২১

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে 'মেজর'। তার এক হাতে একটা কাচের গেলাশ ভর্তি দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আর এক হাতে কয়েকখানা হাতে-গড়া রুটি! সে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলেছে বলেই অত জোরে শব্দ হয়েছে।

'মেজর' চোখ বড় বড় করে বলল, "বাপ রে! তোমাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল! জানো তো, কী কাণ্ড? কাল তোমার দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছি। এখন এসে তা দেখে ভাবলুম পাখি বোধ-হয় উড়ে গেছে! কী ব্যাপার, তুমি এত লক্ষ্মীছেলে হয়ে গেলে যে, পালাবার চেষ্টা করোনি?"

সন্তু হাসল। তারপর বলল, "দরজায় যে তালা লাগাননি, সে কথা বলে যাবেন তো! আমি জানব কী করে যে ডাকাতরাও তালা দিতে ভুলে যায়!"

'মেজর' বলল, "ভাগ্যিস তুমি পালাওনি! তা হলে রাজকুমার আর আমায় আস্ত রাখত না! রিভলভারের ছ'টা গুলিই পুরে দিত আমার মাথার খুলিতে। তুমি আমায় খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ। তারপর, কী, খিদেটিদে পায়নি? এই নাও, দুধ আর রুটি এনেছি।"

সন্তু বলল, "আমি দাঁত না মেজে কিছু খাই না!"

'মেজর' বলল, "এই রে! তাহলে তো তোমায় নীচে নিয়ে যেতে হয়! নীচে কুয়ো আছে। কিন্তু তোমায় তো ঘর থেকে বার করার হুকুম নেই। তা বাপু, একদিন দাঁত না মেজেই খেয়ে নাও বরং!"

সন্তু বলল, "না, তা পারব না। আমার ঘেন্না করে।"

"তোমার জন্য কি আমি বিপদে পড়ব নাকি? তোমাকে আমি নীচে নিয়ে যাই, তারপর তুমি যদি একটা দৌড় লাগাও? এই পাহাড়ি জায়গায় তোমার পিছু পিছু আমি ছুটতে পারব না!"

"সকালবেলা ছোটাছুটি করার ইচ্ছে আমার নেই।"

"অত সব আমি শুনতে চাই না। এই তোমার খাবার রইল। খেতে হয় খাও, না হলে যা ইচ্ছে করো!"

লোকটি ঘরের মধ্যে গেলাশটা নামিয়ে তার ওপরেই রুটি রেখে দিল। তারপর দরজাটা খোলা রেখেই চলে গেল।

যখন অন্য কোনো কাজ থাকে না, তখন খুব খিদে পায়। গরম দুধ দেখেই সন্তুর পেট জ্বলতে শুরু করেছে। সে জানে, হাতের কাছে খাবার দেখলে কখনো অবহেলা করতে নেই। বিশেষত এইরকম বিপদের অবস্থায় কখন কী হয় তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করলেই এরা তাকে শাস্তি দেবার জন্য খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। সেইজন্য খেয়ে নেওয়াই উচিত।

কিন্তু ঐ 'মেজর'কে যে সে বলল, দাঁত না মেজে খেতে তার ঘেন্না করে। এখন সে খেয়ে নিলে লোকটা নিশ্চয়ই তাকে হ্যাংলা ভাববে।

লোকটা দরজাটা খোলা রেখে গেছে। কী ব্যাপার, এবারেও ভুলে গেছে নাকি?

তক্ষুনি 'মেজর' আবার ফিরে এল। তার এক হাতে এক মগ জল।

সে গজগজ করে বলল, "এই নাও, জল এনেছি। এখানেই চোখ-মুখ ধুয়ে নাও।"

সন্তু বলল, "দাঁত মাজব কী দিয়ে? একটা নিমগাছের ডাল ভেঙে আনতে পারলেন না?"

"ইশ, তোমার শখ তো কম নয়! এর পর বলবে, শুধু রুটি খাব না। আলুর দম চাই। হালুয়া চাই! এই জলেই আঙুল দিয়ে দাঁত মেজে নাও!"

সন্তু দেখল কালকের রাত্তিরের সেই গাছের ডাল কেটে বানানো কলমটা তখনও সেখানে পড়ে আছে। সেটাকেই সে তুলে নিল। কোন্ গাছের ডাল তা কে জানে! সেই কলমটারই উল্টো দিকটা চিবিয়ে দাঁতন বানিয়ে নিয়ে সে দাঁত মাজল। বেশ মজা লাগল তার।

দুধটা এখনো বেশ গরম আছে। তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে রুটি তিনটে খেয়ে ফেলল। কাছেই মেজর বসে রইল উবু হয়ে। তার

পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মস্ত বড় ঝোলা গোফের জন্য তার মুখখানা সিন্ধুঘোটকের মতন দেখায়।

খেতে খেতে সন্তু ভাবল, এই 'মেজর' লোকটি কিন্তু ঠিক ডাকাতদের মতন নয়। প্রথম থেকেই সে সন্তুর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছে। কাল রাত্তিরে চিঠি লেখার সময় সন্তুর দিকে তাকিয়ে ও একবার যেন চোখ টিপেছিল না? কেন, কিছু কি বলতে চায়? সন্তু জিজ্ঞেস করবে, না ও নিজের থেকেই বলবে?

এই যে সন্তুর মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিল লোকটা, এটাও কম কথা নয়। গেলাস প্রায় ভর্তি করে দুধ এনেছে। আধ গেলাসও তো দিতে পারত!

সন্তুর খাওয়া শেষ হতে 'মেজর' বলল, "হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারছি। আর দু'খানা রুটি খাবে?"

সন্তু বলল, "না।"

"আচ্ছা, এবারে তা হলে শুয়ে পড়ো। তোমার তো এখন কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই! যতক্ষণ তোমার কাকাবাবু জঙ্গলগড়ের নক্‌শাটা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তোমাকে এইভাবেই থাকতে হবে!"

"আচ্ছা, জঙ্গলগড়ে আপনারা কী খুঁজছেন বলুন তো?"

"তুমি জানো না?"

"না। কাকাবাবু আমায় কিছুই বলেননি!"

"ও-হো-হো-হো! তুমিও জানো না। আমি ও জানি না!"

"আপনিও জানেন না? তা হলে আপনি এই ডাকাতের দলে রয়েছেন কেন?"

"ডাকাতের দল আবার কোথায়? আমি তো কোনো ডাকাতের দলে নেই!"

"আপনি এদের দলে নন? তা হলে···মানে, এরা যে আমায় এখানে আটকে রেখেছে···আপনিও তো তাতে সাহায্য করছেন!"

"সে হল অন্য ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা কী জানো? তোমায় বলছি, আর কারুকে জানিও না! আমি একটা বাড়িতে ঢুকে লোভ

সামলাতে পারিনি। কয়েকখানা হিরে চুরি করেছিলুম। তারপর অবশ্য পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করে সে হিরে সব কটাই উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আমায় জেলেও দিয়েছিল। তা চুরি করার জন্য জেল নাহয় খাটতুম দু' তিন বছর। কিন্তু যে-বাড়ি থেকে আমি চুরি করে-ছিলুম, সেই বাড়ির একজন দারোয়ান খুন হয়েছে। পুলিশ এখন সেই খুনের দায়ে আমাকে জড়াতে চায়। কী অন্যায় কথা বলো তো! আমি খুন করিনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো। খুনটুন করার সাহস আমার নেই। শুধু শুধু আমি কেন খুনের দায়ে ফাঁসি যাব?"

"আপনি জেল থেকে পালিয়েছেন?"

"আমি একলা নয়। সবশুদ্ধু ন' জন। কাগজে পড়োনি, আগরতলা জেল ভেঙে আসামিদের পালানোর খবর? অন্যরা পালাচ্ছিল, আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম!"

"তারপর?"

"তারপর এই তো দেখছ এখানে!"

"জেল থেকে পালিয়ে এখানে আছেন? এটা আপনার নিজের বাড়ি?"

"এটা আমার বাড়ি? আমার এত বড় বাড়ি থাকলে কি আমি হিরে চুরি করি? এটা আগেকার কোনো রাজা-টাজাদের বাড়ি হবে বোধহয়। কেউ থাকত না। আমিই তো এসে পরিষ্কার করেছি।"

"এটা ঐ রাজকুমারের বাড়ি?"

"হতেও পারে, না-ও হতে পারে। সে-সব আমি জানতে চাইনি। আমার কাজ উদ্ধার হলেই হল।"

"কাজ মানে?"

"জেল থেকে পালালে তো সারাজীবন পালিয়েই থাকতে হয়। কোনোদিন নিজের বাড়িতে ফিরতে পারব না। আমরা যারা এই জেল থেকে বেরিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে এই রাজকুমার বলেছে যে, আমরা যদি ওর কাজ উদ্ধার করে দিই, তা হলে উনি আমাদের নামে কেস তুলিয়ে নেবেন। পুলিশ আর আমাদের কিছু বলবে না।

জঙ্গলগড়ে কী আছে না আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি রাজকুমারকে সাহায্য করব, রাজকুমার আমায় সাহায্য করবে, ব্যাস!"

"রাজকুমার যদি মানুষ খুন করতে বলে, তাও করবেন?"

"মাথা খারাপ! আমি অত বোকা নই! খুন করে আবার পুলিশের ফাঁদে পড়ব! খুন করিনি, তাতেই প্রায় ফাঁসি হয়ে যাচ্ছিল!"

"কিন্তু এই রাজকুমার তো সাংঘাতিক লোক!"

"সে যেমন থাকে থাক না, তাতে আমার কী? আমি ওসব সাতে পাঁচে নেই। এখন তোমার ওপর আর তোমার কাকাবাবুর ওপরে আমার সব কিছু নির্ভর করছে। তোমরা যদি মানে মানে জঙ্গলগড়ের জিনিসপত্তর সব রাজকুমারকে দিয়ে দাও, তা হলেই আমরা ছাড়া পাই। রাজকুমার বলেছে, পুরো কাজ হাঁসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিষ্কৃতি নেই।"

"ঐ কর্নেলও সেই দলে?"

"হ্যাঁ, ও-ওতো আমারই মতন জেল-পালানো।"

"ওর নাম কর্নেল কেন?"

"কাজ হিসেবে এক-একজনের এক-একটা নাম দেওয়া হয়েছে। আসল নাম ধরে কারুকে ডাকা নিষেধ। এই যাঃ, তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললুম। আসলে, সকালের দিকটায় আমার মনটা খুব নরম থাকে। আর ঠিক তোমার মতন বয়েসি আমার একটা ভাই আছে তো! আমি যে তোমাকে এত সব কথা বলেছি, তা যেন রাজকুমারকে আবার বলে দিও না! কী, বলবে না তো?"

"না, হঠাৎ রাজকুমারকে আমি এসব বলতে যাব কেন?"

"তবে তুমি এখানে থাকো। আমি যাই, চায়ের জল-টল বসাই গিয়ে। বাবুরা সব এখনো ঘুমোচ্ছেন। তোমার চিঠি তোমার কাকাবাবুর কাছে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে বোধহয়।"

দরজা বন্ধ করে দিয়ে 'মেজর' চলে গেল।

সন্তু গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। এখানে সময় কাটবে কী করে? সকালবেলা তার যে-কোনো ধরনের বই পড়া অভ্যেস। কিংবা

একা একা বেড়াতেও তার ভাল লাগে। বাইরে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গল। গেটের বাইরে দু'তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। একটাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

এইভাবে তাকে ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকতে হবে! কাকাবাবুকে সে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনতে চায়নি। কাকাবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, সন্তু কেন ঐ রকম চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছে।

কাকাবাবু যে কখন, কী ভাবে এখানে এসে পড়বেন, তা কিছুই বলা যায় না। যদি এই মুহূর্তে কাকাবাবু পেছন থেকে 'সন্তু' বলে ডেকে ওঠেন, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কী খেয়াল হল, সন্তু জানলার কাছ থেকে সরে এসে বন্ধ দরজাটা ধরে টান মারল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। এবারেও দরজায় তালা লাগায়নি, এবারেও ভুলে গেছে? তা কখনো হতে পারে? এটা কোনো ফাঁদ নয় তো!

যাই হয় হোক ভেবে সন্তু দরজার বাইরে পা বাড়াল।

২২

সামনে একটা টানা বারান্দা। কোথাও কেউ নেই। তবে কিসের একটা শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু একটু আগেই সন্তু জানলা দিয়ে দেখেছে যে আকাশ একেবারে নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। তারপর মনে হল, কেউ যেন পাথরের ওপর আর একটা পাথর ঘষছে। আরও একটু মন দিয়ে শোনবার পর সন্তু বুঝতে পারল, আসলে ওটা কারুর নাক ডাকার আওয়াজ।

আওয়াজটা পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। সন্তু পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল। সে-ঘরের দরজা বন্ধ। সন্তু হাত দিয়ে একটু ঠেলল, তবু সেটা খুলল না।

সন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেল। এ

ঘরের দরজা খোলা। কোনো বিছানা-টিছানা নেই, খালি মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে 'কর্নেল' আর দুজন লোক। 'কর্নেল'-এর মাথার কাছে রয়েছে রিভলভার। বোধহয় ওদের পাহারা দেবার কথা ছিল।

সন্তর একবার লোভ হল চুপি চুপি গিয়ে টপ করে রিভালভারটা তুলে নেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিল। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ওরা কেউ, তা হলে মুশকিল আছে। 'কর্নেল' লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর ধরনের।

সন্তু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার বুকের ভেতরটা ছমছম্ করছে। তাকে যে কেউ বাধা দিচ্ছে না, এটাতেই ভয় লাগছে বেশি। খালি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকে লক্ষ করছে। হঠাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একতলাতেও কারুকে দেখা গেল না। সেই 'মেজর'-ই বা গেল কোথায়? একতলায় সবকটা ঘর তালাবন্ধ। অনেক দিন সেইসব তালা খোলা হয়নি মনে হয়। মাঝখানে একটা উঠোন। তার এক পাশে একটা ছোট দরজা, সেটা দিয়ে বোধহয় বাড়ির পেছনটায় যাওয়া যায়।

সন্তু সেই দরজার কাছে এসে উঁকি মারল। কাছেই একটা কুয়ো। বেশ উঁচু করে পাড় বাঁধানো। দুটো খরগোশ সেখানে ঘুরঘুর করছে। সন্তু কোনো শব্দ করেনি, শুধু তার ছায়া পড়তেই ওরা টের পেয়ে গেল। দু'এক পলক কান খাড়া করে খরগোশ দুটো দেখল সন্তুকে। তারপরই পেছন দিকটা উঁচু করে মারল লাফ। প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সন্তু কুয়োটার কাছে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। খরগোশ দুটোর গায়ের রং পুরো সাদা নয়, খয়েরি-খয়েরি, তার মানে ওরা বুনো খরগোশ। একটু দূরে একটা করমচা গাছের নীচে আর একটা খরগোশ বসে আছে। এবারেও এর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৌড় মারল। বেশ মজা লাগল সন্তুর। এখানে তো অনেক খরগোশ। সেইজন্যই কাল

রাত্রে 'মেজর' লোভ দেখাচ্ছিল খরগোশের মাংস খাওয়াবার।

বাড়ির পেছন দিকটায় এক সময় নিশ্চয়ই বেশ বড় বাগান ছিল। এখন ফুলগাছ-টাছ বিশেষ নেই, আগাছাই বেশি। বাউণ্ডারি দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ। তাতে কত যে কাঁঠাল ফলে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলো পাকা কাঁঠাল মাটিতেও পড়ে আছে, কেউ খায় না বোধহয়। সন্তুও কাঁঠাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু এঁচোড়ের তরকারি তার ভাল লাগে। এত কাঁঠালে কত এঁচোড়ের তরকারিই না হতে পারে!

শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যেন হঠাৎ ডাকাত-ফাকাত, গুপ্তধন, মারামারির কথা সব ভুলে গেল। মাথার ওপর নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সন্তুর মনে হল সে যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে। টিলার ওপর এইরকম একটা বাড়ি, কাছাকাছি মানুষজন নেই। এইরকম জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। মা-বাবা আর সবাই মিলে এলে কী ভাল হত।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল। গেটের কাছে তিনটে ঘোড়া এখনো বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুর কালকের রাতের কথা মনে পড়ল। বাব্বাঃ, এক রাতের মধ্যে কত কী কাণ্ডই না ঘটেছে! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এই ডাকাতরা সন্তুকে ধরে আনলেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, কাকাবাবুর আর অসুখ নেই, তিনি ভাল আছেন।

কাকাবাবু কি তার চিঠিটা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে?

সন্তু একবার মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। কই, কেউ তো জাগেনি। কেউ তো তার ওপর নজর রাখছে না। সন্তু এখন স্রেফ একটা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলে কে তাকে ধরবে?

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সন্তু দাঁড়াল। এগুলো বেশি বড় ঘোড়া নয়। পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া। এই একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালালে কেমন হয়?

সন্তু কখনো ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তবু তার ধারনা হল, টাট্টু-

ঘোড়ার পিঠে চাপা সহজ। যে-কেউ পারে। একটা ঘোড়ার পিঠে হাত রাখল সন্তু, ঘোড়াটা শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, সন্তুকে লাথি-টাথি কিছু মারার চেষ্টা করল না।

ঘোড়ায় চাপার ইচ্ছেটা সন্তুর একেবারে অদম্য হয়ে উঠলো। একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে লাগামটা হাতে নিল সে। পিঠে কিন্তু জিন নেই। লাফিয়ে কী করে পিঠে উঠবে, ভাবতে ভাবতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। লোহার গেট বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপা যেতে পারে।

সেইভাবে ঘোড়াটায় উঠে সন্তু বলল, হ্যাট হ্যাট!

কিন্তু ঘোড়াটা নট নড়ন-চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তু তার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা গোঁত্তা দিলেও কোনো লাভ হলো না।

কিন্তু একবার ঘোড়ায় চেপে পালাবার প্ল্যান করে আবার সেটা বদলাবার কোনো মানে হয় না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে তা হলে সন্তুকে দেখে নিশ্চয়ই হাসবে। ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ, অথচ ঘোড়া ছোটাতে জানে না!

মরীয়া হয়ে সন্তু হাঁটু দিয়ে গোঁত্তাও মারতে লাগল, আর লাগামটা ধরেও টানতে লাগল খুব জোরে।

তাতে ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি আওয়াজ করে শূন্যে দু'পা উঁচু করল একবার। তারপর ছুটতে লাগল।

প্রথম ঝাঁকুনিতে সন্তু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনো রকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু বল্‌গাটা খসে গেল তার হাত থেকে। মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে সে বল্‌গাটা আর ধরতে পারল না কিছুতেই।

ঘোড়াটা যখন বেশ জোরে টিলার নীচের দিকে নামতে লাগলো, তখন সন্তুর মনে হল, সে আর কিছুতেই ব্যালান্স রাখতে পারবে না। এই অবস্থায় ছিটকে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চয়ই। আর কোনো উপায় না দেখে সন্তু ঘোড়াটার গলাটা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে।

ঘোড়াটাও বেশ অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ সে মাঝে মাঝেই চিঁ-হি-হি-হি করে ডাক ছাড়ছে। সে ছুটছেও এলোমেলো ভাবে।

টিলাটার নীচেই জঙ্গল, সেখানে ঢুকে ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বড় বড় গাছের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্তুর গা ঘষটে যাচ্ছে। এক একবার সে ভাবছে কোনো গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে কি না। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

কোন্‌দিকে যে ঘোড়াটা যাচ্ছে তাই বা কে জানে! জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে। কাল রাত্তিরে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল কি না তা সন্তুর মনে নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতেই তো পায়নি সে।

প্রায় আধঘন্টা বাদে ঘোড়াটা একটা নদীর সামনে থামল। কাল রাতেও সন্তুরা একটা নদী পার হয়েছিল। এটা কি সেই নদী? তাই বা কে জানে!

যা থাকে কপালে ভেবে সন্তু লাফিয়ে নেমে পড়ল নদীর ধারের নরম মাটিতে। আসলে ঐ ভাবে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরকম ভাবে আর যাওয়া যাবে না।

যাই হোক, সন্তু মোটামুটি তার সার্থকতায় বেশ খুশি হয়েছে। বিনা বাধাতেই সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার কোনো আপত্তি নেই। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোনো এক সময় সে একটা কোনো শহরে পৌঁছে যাবে।

এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে সন্তু কোনো মানুষজন দেখেনি। এবারে নদীর ধারে সে যেন কাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল।

একটা কী যেন বড় গাছ নদীর ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। কথা শোনা যাচ্ছে তার ওধার থেকেই। সন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলো দু'জন জেলে মাছ ধরছে। একজন বয়স্ক লোক, একজন প্রায় সন্তুর সমান।

সন্তু ভাবল, যাক, ভয়ের কিছু নেই। তবে তক্ষুনি সে লোকগুলোর কাছে গেল না। এদিকেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ওদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই ওদের কয়েকটা কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স্ক জেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে, "সবই কপাল, বুঝলি? আমিও মাছ ধরি আর তোর সুবলকাকুও মাছ ধরত। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা সমানে এই কাজ করেছি। মাছ ধরা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। অথচ, আজ আমি কোথায় আর তোর সুবলকাকু কোথায়!"

ছেলেটি বলল, "সুবলকাকুকে তো সাপে কামড়েছে!"

জেলেটি বলল, "সাপে কি আর এমনি এমনি কামড়েছে। নিয়তি যে ওরে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বারণ করেছিলুম।"

ছেলেটি বলল, "মাছ ধরা ছেড়ে সুবলকাকু জঙ্গলে খড়গোশ মারতে গিয়েছিল।"

"খরগোশ না হাতি! আমরা জলের মাছ মারতে জানি, ডাঙার শিকারের কী জানি! আসল কথা কী জানিস, একদিন হাট থেকে সুবল আর আমি ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতেছিলাম, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস চকচক করে উঠল। একটুখানি মাটি খুঁড়ে সুবলই সেটা টেনে তুলল। সেটা একটা সোনার টাকা। আগেকার রাজা মহারাজাদের আমলে ঐ রকম টাকার চল ছিল। তা সেই টাকাটা পেয়ে সুবলের কী আহ্লাদ। লাফাতে লাগল একেবারে। আমি বললুম, ওরে সুবল, এসব বড় মানুষদের জিনিস, গরিবের ঘরে রাখতে নেই। ও টাকাটা তুই থানায় জমা দিয়ে দে। তা সে-কথা সে কিছুতেই শুনবে না। সোনার টাকা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেল। অন্য কাজকম্ম সব ছেড়েছুড়ে দিনরাত জঙ্গলে পড়ে থাকত। লোককে বলত খরগোশ মারতে যায়, কিন্তু আমি তো জানি! ও সেখেনে যত গর্ত আছে আর পাথরের ফোঁকর আছে, সব জায়গায় হাত ভরে ভরে খুঁজত। সেইরকম একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েই তো সাপের কামড় খেলে!"

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলের মধ্যে একখানা সোনার টাকা এল কী করে?"

বয়স্ক লোকটি বলল, "ও জায়গাটারে কয় জঙ্গলগড়। এককালে

ওখানে ত্রিপুরার এক মহারাজা এসে লুকিয়ে ছিলেন। তাই লোকে এখনো বলে, ওখানকার মাটির নীচে অনেক সোনাদানা পোঁতা আছে।”

জঙ্গলগড়ের নাম শুনেই সন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বয়স্ক লোকটি তা হলে জানে জঙ্গলগড় কোথায়? তা হলে তো এক্ষুনি ওর সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু সন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল। টগবগ টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে।

২৩

পুলিশরা যে লোকটিকে ধরে নিয়ে এসেছে, কাকাবাবু তার আপাদ-মস্তক দেখলেন কয়েকবার। ধুতি আর নীল রঙের শার্ট-পরা সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ। মুখে একটা ভয়ের ছাপ।

কাকাবাবু বললেন, “ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এ লোকটাকে ধরে রেখে কোনো লাভ নেই। কই, চিঠিটা কই?”

শিশির দত্তগুপ্ত উঠে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, “এই, তুই এই চিঠি কোথায় পেয়েছিস?”

লোকটি বলল, “আমি বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম, একজন লোক এসে বলল, এই চিঠিটা রাজার অতিথিশালায় পৌঁছে দিলে আমায় ইয়ে মানে একটা টাকা দেবে, তাই আমি—”

শিশির দত্তগুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, “সবাই এই এক গল্প বলে! যদি জেলে যেতে না চাস তো সত্যি কথা বল্!”

লোকটি বলল, “এক টাকা নয়, ইয়ে, মানে, পাঁচ টাকা!”

“অ্যাঁ?”

“সত্যি কথা বলছি স্যার, দশ টাকা দিয়েছে! আমি দিব্যি কেটে বলছি, তার বেশি দেয়নি।”

“একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য দশ টাকা দিল?”

"হ্যাঁ, স্যার। ফস্ করে টাকাটা আমার পকেটে গুঁজে দিল। আমি ভাবলুম, ডাকে চিঠি যেতে পঁয়তিরিশ পয়সা লাগে, আর আমি পাচ্ছি দশ টাকা! মোটে তো ছু' পা রাস্তা। তাই ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলুম।"

"ওদের মানে? এই যে বললি একটা লোক? ফের মিথ্যে কথা!"

"মানে, একজন লোকই আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আর একটা লোক পাশে দাঁড়িয়েছিল।"

"তারা তোর চেনা?"

"না স্যার। কোনোদিন দেখিনি।"

"অচেনা লোক এসে তোকেই চিঠি দেবার কথা বলল কেন?"

"আমি এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলুম কি না, পকেটে একটাও পয়সা নেই, ভাবছিলুম কী করে কিছু রোজগার করা যায়, তাই বোধহয় ওরা ঠিক বুঝেছে!"

"লোকছুটোকে দেখতে কেমন?"

"খুব ভাল দেখতেও নয়, আবার খুব খারাপ দেখতেও বলা যায় না।"

"ভাল খারাপের কথা হচ্ছে না। লোকছুটোকে দেখলে কী মনে হয়, চোর-ডাকাতের মতন?"

একটু চিন্তা করে লোকটি বলল, "আজ্ঞে না!"

"তবে কি ভদ্রলোকের মতন?"

"আজ্ঞে না।"

"চোর-ডাকাতের মতনও না। ভদ্রলোকের মতনও না। তবে কিসের মতন?"

"আজ্ঞে, পুলিশের মতন!"

"অ্যাঁ?"

"খুব গাঁট্টাগোট্টা চেহারা আর লম্বা গোঁপ আছে।"

"তুই যে বাজারের সামনে একলা একলা দাঁড়িয়ে ছিলি, তার কোনো সাক্ষী আছে?"

"স্যার, সাক্ষী রেখে কি একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকা যায়?"

"ফের মুখে মুখে কথা বলছিস? যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দে!"

"পান্নাদার পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, পান্নাদা নিশ্চয়ই দেখেছে আমাকে!"

শিশির দত্তগুপ্ত একজন পুলিশকে বললেন, "অবিনাশ, একে বাজারের কাছে নিয়ে যাও! লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ছাখো, এ সত্যি কথা বলছে কি না!"

পুলিশ দু'জন লোকটিকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু সন্তুর চিঠিটা দু'তিনবার পড়লেন, কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখলেন ভাল করে। তারপর সেটা এগিয়ে দিলেন নরেন্দ্র ভার্মার দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এটা সন্টুর হ্যাণ্ডরাইটিং ঠিক আছে তো?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-জায়গায় সন্তুকে আটকে রেখেছে, সেখানে ত কাগজ-কালি-কলম কিছু পাওয়া যায় না। জঙ্গলের মধ্যে কোনো গোপন আস্তানা মনে হচ্ছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এরা খুব কুইক কাজ-কাম করে তো! বহোত জলদি চিঠি চলে এলো! তার মানে খুব বেশি দূরে নেই! ঠিক কি না? এখন কী করা যাবে?"

শিশির দত্তগুপ্ত চিঠিটা নিয়ে দু'বার পড়লেন। তারপর বললেন, "এবারে সব কটাকে জালে ফেলা যাবে! আপনি ওদের সঙ্গে একলা দেখা করবেন। আমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে দূরে অপেক্ষা করব। আপনার হাত থেকে ওরা জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা যেই নিতে যাবে, অমনি আমরা ক্যাঁক করে চেপে ধরব ওদের!"

কাকাবাবু বললেন, "দেখা করব মানে? কোথায় দেখা করব? সে রকম কোনো জায়গার কথা তো লেখেনি?"

"তাই তো! আসল কথাটাই লিখতে ভুল গেছে!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সন্টু তো জঙ্গলগড়ের প্ল্যান একে পাঠিয়ে দিতে বলেছে!"

কাকাবাবু বললেন, সেটাই বা পাঠাব কোথায়?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সন্টু ছোকরা বহোত দুষ্টু আছে। ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট চিঠি লিখেছে, যাতে কি না আরও টাইম পাওয়া যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু তো আর নিজের ইচ্ছেতে এই চিঠি লেখেনি, ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে। এই দ্যাখো কাগজের ওপর এক ফোঁটা রক্ত। এ কার রক্ত বলে মনে হয়?"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ইশ! একটা ছোট ছেলের ওপর অত্যাচার করেছে ওরা। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একদিন সব কটাকে ধরে চাব্‌কাব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার খালি ভয় হচ্ছে, সন্তু আবার পালাবার চেষ্টা না করে! ও যা ছটফটে ছেলে। চুপচাপ বন্দী হয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আরও বিপদ হবে। ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক!"

শিশিরবাবু উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, "আমি একটা জিনিস ভাবছি, ওদের কাছে একটা টোপ দিলে কেমন হয়?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "টোপ? টোপ কী?"

শিশিরবাবু বললেন, "বেইট! কিংবা ডিকয়! ধরুন, আমরা আর একটা লোককে অবিকল মিস্টার রায়চৌধুরীর মতন সাজিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা নিশ্চয়ই তাকে ফলো করবে। তারপর তাকে ধরবে। তখন পেছন পেছন গিয়ে আমরা ওদের সব কটাকে ধরব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মতন একজনকে সাজাবেন? তা আবার হয় নাকি? সে তো ওরা চিনে ফেলবে!"

শিশিরবাবু বললেন, "না, না, অত সহজ নয়। আমাদের পুলিশ লাইনে ছদ্মবেশের এক্সপার্ট আছে। দেখবেন একজনকে এমন আপনার

মতন সাজিয়ে আনব যে, আপনি নিজেই চিনতে পারবেন না। একেবারে ক্রাচ-ট্রাচ সব থাকবে!"

কাকাবাবু বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমার একজোড়া ক্রাচ্ চাই, আজ দুপুরের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন। আমার মতন একজনকে সাজাবার দরকার কী, আমি নিজেই তো জঙ্গলে একা যেতে পারি।"

শিশিরবাবু বললেন, "না, না, আপনাকে আর আমরা বিপদের মধ্যে পাঠাতে চাই না। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর অনেক ধকল গেছে এর মধ্যেই!"

নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনিই বলুন মিঃ ভার্মা, মিঃ রায়চৌধুরীকে কি আবার বিপদের মধ্যে পাঠানো উচিত?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠাবার যে এরকম রেজাল্ট হবে, তা তো বুঝিনি আগে। বিলকুল সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল কি না! আমাদের প্ল্যান সব গড়বড় হয়ে গেল!"

শিশিরবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা মিঃ রায়চৌধুরীকে প্ল্যান করে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছেন? কেন?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ হাঁ, এটা দিল্লি থেকে প্ল্যান করা হয়েছিল। আমার বস্ মিঃ রাজেন্দ্র ভার্গবের মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে। আপনি যেমন বললেন না, সেইরকম আগেই আমরা রাজা রায়-চৌধুরীকে এখানে টোপ ফেলেছি।"

বলেই নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে লাগলেন। কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, "বাঃ, বেশ মজা! আমাকে তোমরা টোপ ফেলবে, আমার জীবনের বুঝি কোনো দাম নেই? গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমায় আবার প্লেনে তোলা হল, তখনই আমি বুঝেছি আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেইজন্যই তো আমি তখন থেকে পাগল সেজে গেলাম!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার জীবনের দাম? তোমাকে মারতে পারে, এমন বুকের পাটা হোল্ ইণ্ডিয়াতে কিসিকো নেহি হ্যায়!

বন্দুকের গুলি খেলেও তুমি মরো না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি সত্যিকারের বন্দুকের গুলি কখনো খাইনি! খেলে ঠিকই মরে যাবো! খেয়েছি তো ঘুম পাড়ানো গুলি!"

শিশির দত্তগুপ্ত তখনো কিছুই বুঝতে পারছেন না দেখে কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন, কলকাতার পার্কে আমায় ঘুম পাড়াবার গুলি মারা হয়েছিল তো! এরকম গুলি তো বাজারে বিক্রি হয় না! তা হলে যে আমাকে মেরেছে, সে এই গুলি পেল কোথায়? আপনি পুলিশের লোক, আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, কয়েক মাস আগে একটা হিংস্র ভাল্লুককে ধরবার জন্য দিল্লি থেকে ঐরকম ছ'টা গুলি আনা হয়েছিল ত্রিপুরায়। ভাল্লুকটাকে দুটো গুলিতেই বশ করা গিয়েছিল। তারপর বাকি চারটে গুলি আর পাওয়া যায়নি!"

শিশিরবাবুর মুখে একটা লজ্জার ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সে গুলি চারটে কী ভাবে হারাল তা কিছুতেই বোঝা গেল না। অনেক খোঁজ করা হয়েছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠানো হল দুসরা একটা কারণে। সে অনেক বড় ব্যাপার। একটা ইন্টারন্যাশ্‌নাল গ্যাংকে পাকড়াতে চেয়েছিলাম। এখন এখানে এসে শুনছি, জঙ্গলগড়, গুপ্‌তধন, ফলানা ফলানা সব লোকাল ব্যাপার! ধুত! চলো, কালই ফিরে যাই!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, সন্তুকে এখনো একদল সাজ্ঘাতিক হিংস্র লোক আটকে রেখেছে। দশটা ইটারন্যাশ্‌নাল গ্যাঙের চেয়েও সন্তুর জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি।"

শিশিরবাবু বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ভাইপোকে ঠিক আমি উদ্ধার করে দেব!"

এই সময় একজন পুলিশ এসে খবর দিল শিশির দত্তগুপ্তের ফোন এসেছে নীচে।

শিশিরবাবু ফোন ধরতে চলে গেলেন আর কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।

শিশির দত্তগুপ্ত ফিরে এলেন দারুণ উত্তেজিতভাবে। দরজার কাছ থেকে বেরিয়ে বললেন, "ধরা পড়েছে! ধরা পড়েছে!"

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, "কে?"

"ওদের তিনজন। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কাল রাতে যারা আপনাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এই তিনজন ছিল সেই দলে। নিজেরাই স্বীকার করেছে। এখন ওদের চাপ দিলে বাকি সব কটার সন্ধান পাওয়া যাবে!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গুড ওয়ার্ক!"

শিশিরবাবু বললেন, "বলেছিলুম না, পালাতে পারবে না। জাল ছড়িয়ে রেখেছি। ওরা ঠিক ধরা পড়বে! লোক তিনটে লক্ আপে আছে। এখন ওদের জেরা করব, চলুন আমার সঙ্গে।"

নরেন্দ্র ভার্মা যাবার জন্য পা বাড়ালেও কাকাবাবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, "আপনারা ঘুরে আসুন, আমার আর যাবার দরকার নেই! আমি ততক্ষণ বরং জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা এঁকে ফেলি।"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ঠিক আছে। সেই ভাল। চলুন, মিঃ ভার্মা!"

ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাকাবাবু আবার ডেকে বললেন, "শিশিরবাবু, আমার জন্য দুটো ক্রাচ্ পাঠাতে ভুলবেন না! আমি এবারে একটু নিজে নিজে হাঁটতে চাই!"

২৪

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেই সন্তু তরতর করে সেই ঝাঁকড়া গাছটায় চড়তে শুরু করে দিল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে। তার শরীরের সমস্ত শিরা যেন টানটান হয়ে গেছে। সে আবার ধরা পড়তে চায় না কিছুতেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেকগুলো ঘোড়া আসছে। তারপর বোঝা

গেল একটাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়াটা ঠিক এই দিকেই আসছে। সন্তু যে-ঘোড়াটার পিঠে এসেছিল, সেটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটু বাদেই দেখা গেল একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল সন্তর ঘোড়াটার পাশে। তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে চিনতে সন্তর প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল। খাকি প্যান্ট আর একটা ছাই-রঙের হাফশার্ট পরা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক। ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি এই গাছের দিকে মুখ ফেরাতেই তার সিন্ধুঘোটকের মতন ঝোলা গোঁফ দেখেই সন্তু চিনতে পারল এ তো সেই 'মেজর'।

একটু দূরে জেলে দু'জনের কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছে। 'মেজর' নদীর ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। তারপর মুখ উঁচু করে বলল, "কই হে সন্তুবাবু, কোথায় লুকোলে? চলে এসো, ভয় নেই!"

সন্তু একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, যাতে কোনো শব্দ না হয়। কিন্তু পাতার আড়ালে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আড়াল পড়েনি। এখানে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যাবে না।

মেজর আবার বলল, "কোন্ গাছে উঠে বসে আছ? ও সন্তুবাবু, শিগগির নেমে এসো! সময় নষ্ট করে লাভ নেই!"

সন্তু বুঝতে পারল, সত্যিই সময় নষ্ট হচ্ছে। 'মেজর' সবকটা গাছ ভাল করে দেখতে শুরু করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে ওঠার সময় তার একপাটি চটি পড়ে আছে গাছের নীচে।

সন্তু ডালপালা সরিয়ে বলল, "আসছি!"

তারপর সরসরিয়ে নেমে পড়ল। মেজর তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সন্তু একটুও অবাক হবার কিংবা ভয় পাবার ভাব না দেখিয়ে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমায় কী করে খুঁজে পেলেন?"

মেজর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এ তো খুব সহজ! তুমি আমাদের এই সব ঘোড়া চালাতে পারবে না তা জানি! ঘোড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে! এই ঘোড়াগুলো নদীর ওপারের একটা গ্রামে থাকে। সেইজন্য ছাড়া পেলে ওরা সেইদিকেই যায়!"

সন্তু বলল, "বিচ্ছিরি ঘোড়া! আমি নেপালে এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়ায় চেপেছি!"

মেজর বলল, "সে যাই হোক! শেষ পর্যন্ত সেই পালালে তা হলে? এখন কী হবে? তুমি আমায় ফাঁসাবার ব্যবস্থা করে এসেছ! রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, তুমি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে একটা গুলি চালাবে না? এখন তোমায় যদি আমি আবার ধরে নিয়ে যাই, তাহলে আমি হয়তো বকশিস পাব, কিন্তু তোমার কী অবস্থা করে ছাড়বে বলো তো?"

সন্তু বলল, "দোষ তো আপনারই। আপনি ভাল করে পাহারা দেননি কেন? দরজা সব সময় খোলা। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লুম! কেউ আমায় দেখতেই পেল না!"

'মেজর' মুচকি হেসে বলল, "আমি কিন্তু দেখেছি! রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সব লক্ষ করছিলুম!"

সন্তু এবার লোকটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কাল রাত্তির থেকেই এ লোকটির ব্যবহার সে ঠিক বুঝতে পারছে না। লোকটা কি ভালমানুষ, না মিচকে শয়তান?

লোকটি বলল, "শোনো, সন্তুবাবু, তোমায় সব কথা খুলে বলি। আমার নাম নরহরি কর্মকার। একটা গভর্নমেন্ট অফিসে সিকিউরিটির ডিউটি করতুম। একবার লোভের বশে হিরে চুরি করেছি। সেজন্য আজ আমার বড় লজ্জা। কিন্তু নিজের দোষে তারপর আমি ক্রমশই চোর-ডাকাতের দলে জড়িয়ে পড়ছি। এ আমি চাই না। শেষে দাগি আসামি হয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে? তাই আমি ইচ্ছে করে তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এসো, তোমাতে আমাতে দু'জনেই এখন পালাই। তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের চেনা আছে। তাঁকে বলে আমার একটু ব্যবস্থা করে দিও। আমি দু'এক বছর জেল খাটতে রাজি আছি, তার বেশি শাস্তি যেন না হয়!"

সন্তু কথাগুলো শুনে গেল, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা

এখনো ঠিক করতে পারল না।

নরহরি কর্মকার বলল, 'এখানে আর থাকা ঠিক নয়। ওরা খুঁজতে শুরু করলে প্রথমে এখানেই আসবে! চলো, এক্ষুনি আগরতলা যাই! তুমি আমার সঙ্গে এক-ঘোড়ায় চেপে যেতে পারবে?"

সন্তু বলল, "আমি এখন আগরতলায় যাব না।"

নরহরি কর্মকার চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল, "আগরতলায় যাবে না? তোমার কাকাবাবু তো সেখানেই আছেন!"

সন্তু বলল, "তা হোক। এখানে কাছেই জঙ্গলগড়। আমি সেখানে যেতে চাই!"

নরহরি বলল, "এখানে জঙ্গলগড়? কে বলল তোমাকে?"

সন্তু দূরের জেলে দু'জনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ঐ ওরা জানে। ওরা বলাবলি করছিল!"

নরহরি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, "দূর! ওসব বাজে কথা! ওরকম কত জঙ্গলগড় আছে! কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা ভাঙা বাড়ি-টাড়ি থাকলেই লোকে তার নাম দেয় জঙ্গলগড়! সেরকম জায়গার তো অভাব নেই এ দেশে!"

সন্তু বলল, "তবু আমি এই জঙ্গলগড়ে একবার যেতে চাই।"

নরহরি বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ! আসল জঙ্গলগড়ের খবর তোমার কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই রাজকুমার আর অন্যরা কি কম খোঁজাখুঁজি করেছে!"

সন্তু বলল, "ওরা যে জঙ্গলগড়ের কথা বলছে, সেখানে একটা সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে!"

নরহরি চমকে উঠে বলল, "মুদ্রা, মানে টাকা? সোনার টাকা? চলো তো!"

দু'পা গিয়েই নরহরি আবার থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় ভাব। ডান হাত দিয়ে গোঁফ চুলকোতে চুলকোতে বলল, "না, না সন্তুবাবু, আমায় আর লোভ দেখিও না। সোনার টাকা শুনেই আমার মনটা চমকে উঠেছিল! একবার হিরে চুরি করে আমি হাড়ে-

হাড়ে বুঝেছি যে আমাদের মতন লোকদের হিরে মুক্তো সোনাদানা সহ্য হয় না! ওসবে একবার হাত দিলেই বিপদ! জঙ্গলগড়ের সোনায় যদি আমি হাত দিই, তা হলে রাজকুমারের দলবল আমায় একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!"

সন্তু আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল জেলে দু'জনের দিকে। নরহরি তার পেছন পেছন এসে কাতরভাবে বলল, "কোথায় যাচ্ছ, সন্তুবাবু! আমি ভাল কথা বলছি, আগরতলায় চলো!"

সন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না।

জেলে দু'জন এখন কথা থামিয়ে মন দিয়ে মাছ ধরছে। একটা জাল ফেলে সেটা টেনে তুলছে খুব আস্তে আস্তে। জাল টেনে তোলার সময় তারা একেবারে চুপ করে থাকে।

সন্তু আর নরহরি ওদের কাছে যখন পৌঁছল, তখনও জালটা পুরো টেনে তোলা হয়নি। বড় জেলেটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শুধু, কোনো কথা বলল না।

জালটা তোলার পর দেখা গেল তার গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ লেগে আছে। চকচকে রুপোলি রঙের।

ছোট জেলেটি জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখতে লাগল। বড় জেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, "এ মাছ বিক্কিরি নেই, মহাজনকে দিতে হবে!"

নরহরি লোকটার ঘাড় চেপে ধরে হুংকার দিয়ে বলল, "তোর মাছ কে চাইছে? জঙ্গলগড়ের সোনার টাকা কে নিয়েছে, আগে বল্!"

লোকটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "সোনার টাকা! আমি তো সোনার টাকা নিইনি! মা কালীর দিব্যি বলছি!"

"তবে কে নিয়েছে?"

"সে তো সুবল!"

"কোথায় সেই সুবল? এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল তার কাছে?"

ছোট জেলেটি এবারে বলল, "সুবলকাকা তো মরে গেছে! তাকে সাপে কামড়েছে!"

নরহরি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "মরে গেছে? মিথ্যে কথা বলছিস আমার কাছে? এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব!"

সন্তু বলল, "ওরা আগেই বলছিল সুবলকে সাপে কামড়েছে। ঠিক আছে, সেই জঙ্গলগড় জায়গাটা কোথায়, আমাদের একটু দেখিয়ে দেবে চলো তো!"

নরহরি বলল, "যেখানে সোনার টাকা পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা আর কে দেখেছে? তুই দেখেছিস?"

বড় জেলেটি বলল, "বাবু, সেখানে যেও না। সেখানে খুব সাপ-খোপের উপদ্রব। জায়গাটা ভাল না!"

নরহরি বলল, "সাপ থাক আর যাই থাক, সে আমরা বুঝব। শিগগির সেখানে আমাদের নিয়ে চল্।"

বড় জেলেটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, "সে যে অনেক দূরের পথ। সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার যে আজকের দিনটার রোজগার নষ্ট হয়ে যাবে!"

নরহরি বলল, "মনে কর তোর জ্বর হয়েছে। তা হলেও কি মাছ ধরে রোজগার করতে পারতি?"

জেলেটি বলল, "আমার জ্বর হয়নি, তবু শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন? মনে করো, তুমি রাজা, তা হলেই কি তুমি রাজা হয়ে যাবে?"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, সবটা পথ তোমায় যেতে হবে না। খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও ঠিক কোন্‌দিকে যেতে হবে!"

ছোট জেলেটিকে সেখানেই বসিয়ে রেখে ওরা তিনজন চলল, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। তার আগে নরহরি ঘোড়া দুটোকে ঠেলে ঠেলে নদীতে নামিয়ে দিয়ে এল। ঘোড়া দুটো সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল নদীর ওপারে।

খানিকটা দূরে গিয়েও নরহরি থেমে গিয়ে ফিসফিসিয়ে সন্তুকে বলল, "উঁহুঃ ঐ ছোঁড়াটাকে ওখানে বসিয়ে রেখে আসা ঠিক হল না। কেউ আমাদের খুঁজতে এলে ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে যাবে।"

সে বড় জেলেটিকে বলল, "এর পর সারাদিন মাছ ধরলে তোর আর কত রোজগার হত ?"

জেলেটি বলল, "মাজ ধরতে পারি না পারি, রোজ মহাজনকে দশ টাকা শোধ দিতে হয়। এখন তো মাছ ওঠেই না।"

নরহরি তার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, "এই নে। এখন ঐ ছেলেটাকেও ডাক। ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তোরা আজ গাঁয়ে ফিরে যাবি। খবরদার, কারুকে কিচ্ছু বলবি না! এসব পুলিশের কাজ, খুব গোপন রাখতে হয়!"

প্রায় এক ঘন্টা চলার পর ওরা নদীর ওপর একটা সাঁকো দেখতে পেল। খুব নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সেটার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে ওরা এক এক করে চলে এল অন্য ধারে।

আবার নদীর ধার দিয়েই হাঁটতে হল প্রায় দেড় ঘন্টা। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। অনেক গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলে।

আসবার পথে গোটা দুয়েক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কয়েকটা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। নদীটাও ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। সামনেই পাহাড় আছে মনে হয়।

এক জায়গায় বড় জেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "এবারে আপনারা যান, আমরা আর যাব না!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলগড় আর কতদূর ?"

"সামনে আর একটুখানি গেলেই দেখতে পাবেন। একেবারে নদীর ধারেই।"

নরহরি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের গাঁ ছেড়ে এত দূরের জঙ্গলে এসেছিলে কেন শুনি ? তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো মতলব ছিল।"

বড় জেলেটি বলল, "নিয়তি, বাবু, নিয়তি! এইদিকে এক গাঁয়ে সুবলের শ্বশুরবাড়ি। একটু আগের ফাঁকা মাঠ দিয়েও যাওয়া যায়, আর এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাওয়া যায়। তা সুবলের কী দুর্বুদ্ধি

হল। বলল, এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই যাই, যদি দু'একটা খরগোশ মারতে পারি। সেই লোভেই তার কাল হল।"

নরহরি বলল, "ঠিক আছে, তোমরা এবারে ফিরে যেতে পারো!"

বড় জেলেটি বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনারা এখন জঙ্গলে যাবেন, তারপর ফিরবেন কখন? জায়গাটা ভাল না। তাছাড়া দুপুরে খাওয়া-দাওয়াই বা করবেন কোথায়?"

নরহরি বলল, "সে আমরা বুঝব। তোমরা এখন যাও তো!"

ওরা চলে যাবার পর সন্তু আর নরহরি খুব সাবধানে এগোতে লাগল। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে নানারকম গর্ত, আর এখন সেখানে পাথর আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে।

তারপর দেখা গেল একটা লম্বা পাথরের দেওয়াল। তার মধ্যে কয়েকখানা পাথরের ঘর, কিন্তু কোনোটারই ছাদ নেই। একটা কারুকার্য করা কাঠের দরজাও পড়ে আছে মাটিতে।

পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু ভাবল, এই কি তবে সেই জঙ্গলগড়?

২৫

কাকাবাবু একা একাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন। নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা শিশির দত্তগুপ্তর দেখা নেই। ওঁরা কোনো খবরও পাঠাননি। তবে একটু আগে শিশির দত্তগুপ্তর একজন আর্দালি এসে এক জোড়া ক্রাচ্ দিয়ে গেছে।

খেয়ে উঠে কাকাবাবু নিজের আঁকা ম্যাপগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। মোট পাঁচটা ম্যাপ। তারমধ্যে চারখানা ছিঁড়ে ফেলে একখানা রাখলেন তিনি। সেটাকে আবার নতুন করে আঁকলেন। তারপর সেটাকে পকেটে ভরে রেখে তিনি ক্রাচ বগলে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। অনেকদিন বাদে তিনি নিজে নিজে হাঁটছেন, কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে।

আকাশটা মেঘলা মেঘলা। চারদিকে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বেশ একটা বেড়াবার মতন দিন। কাকাবাবু ভাবলেন, এখন সন্তু কোথায়? কী করছে? ছেলেটাকে ওরা ঠিকমতন খেতে-টেতে দিয়েছে তো?

এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটার অসুবিধে এই যে, খট্ খট্ শব্দ হয়। কাকাবাবুর নিজস্ব ক্রাচের তলায় রবার লাগানো আছে। কিন্তু সে দুটো তো সঙ্গে আনেননি।

নীচতলায় যে দু'জন পুলিশের পাহারা দেবার কথা. তারা এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাকাবাবু যে বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তা তারা লক্ষও করল না। কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন।

সামনের লোহার গেটটা অবশ্য বন্ধ। তালা দেওয়া। অগত্যা কাকাবাবু নিজেই গেটের গায়ে দু'বার থাবড়া মারলেন। সেই আওয়াজ শুনে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল আর কাকাবাবুকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতন মুখের ভাব হয়ে গেল তার।

একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বললে, "এ-এ-এ কী স্যার! আ-আ-আ-প্‌নি!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব, গেটটা খুলে দাও!"

পুলিশটি বলল, "আ-আ-প্‌নি বেড়াতে যা-যা-যাবেন? আপনার তো অসুখ। আপনি নিজে নিজে হাঁটছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। খেয়ে ওঠার পর আমার একটু হাঁটাহাঁটি করা অভ্যেস।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে। আমরা ততক্ষণে একটু খেয়ে নিই। উনুনে তরকারি ফুটছে!"

"আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।"

"না, স্যার, তা হয় না! আমাদের বড় সাহেব বলেছেন..."

"তোমাদের বড় সাহেব কি আমায় আটকে রাখতে বলেছেন? যাও,

শিগগির চাবি নিয়ে এসো!"

কাকাবাবুর ধমক খেয়ে লোকটি আর তর্ক করতে সাহস করল না। চাবি এনে গেট খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের সাহেব এলে বসতে বোলো। আমি ফিরে আসব। আর দিল্লি থেকে যে সাহেব এসেছিলেন, তিনি ফিরলে বোলো, আমার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেছি।"

"কোথায় যাচ্ছেন স্যার, বলে যাবেন না?"

"বললুম তো, একটু বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন হাঁটা হয়নি ভাল করে!"

গেট থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটলেন না। একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসলেন।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে যাব, বাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, যেদিকে খুশি! বেশ মেঘলা মেঘলা দিন, আমায় কোনো ভাল জায়গায় একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এসো। তুমি দশটা টাকা পাবে।"

রিকশা চলতে শুরু করতেই কাকাবাবু চোখ বুজলেন। যেন তাঁর কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। সত্যিই তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

দু'জন সাইকেল-আরোহী একটু বাদেই কাকাবাবুর দু'পাশ দিয়ে চলে গেল তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে। খানিক দূর গিয়ে লোক দুটি আবার ফিরে এল। কাকাবাবুকে আবার ভাল করে লক্ষ করে তারা চলে গেল খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে। কাকাবাবু এসব কিছুই দেখলেন না। যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।

সাইকেল রিকশাটা শহরের ভিড় ছাড়িয়ে চলে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনেই একটা ছোট পাহাড়। আকাশে মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

রিকশাওয়ালা থেমে গিয়ে বলল, "ও বাবু! বৃষ্টি আসতেছে। এবার কোথায় যাবেন?"

কাকাবাবু চোখ মেলে উঠে বসে বললেন, "এ কোথায় এসেছ?

বাঃ, বেশ জায়গাটা তো!”

রিকশাওয়ালা বলল, “এ দিকটা তো বাবু কুঞ্জবন। কাছেই পুরনো রাজবাড়ি আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “রাজবাড়ি আছে থাক, সেদিকে যাবার দরকার নেই, আরও ফাঁকার দিকে চলো।”

“জোরে বৃষ্টি এসে যাবে যে বাবু!”

“ও, বৃষ্টি আসবে বলছ! তা হলে তো আর তোমার সাইকেল রিকশায় চলবে না!”

কাকাবাবু রিকশা থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। যেন তিনি কোনো চেনা লোককে খুঁজছেন। কিন্তু কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। তবে দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে।

রিকশা-চালককে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে কাকাবাবু বললেন, “তুমি এবারে যেতে পারো।”

রিকশাচালক তবু চিন্তিতভাবে বলল, “জোর বর্ষা আসছে, আপনি এখান থেকে ফিরবেন কী করে?”

কাকাবাবু বললেন, “সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি এখন ফিরব না।”

মোষের গাড়িটা কাছে আসতেই কাকাবাবু হাত তুলে সেটাকে থামালেন। গাড়োয়ান ছাড়া সে গাড়িতে আর কেউ নেই। মাঝ-খানের ছাউনিতে রয়েছে কয়েকটা বস্তা।

কাকাবাবু সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোন্ দিকে যাচ্ছ গো কর্তা?”

গাড়োয়ান বলল, “যাচ্ছি তো বাবু, অনেক দূর। সেই কমলপুর।”

কাকাবাবু সন্তুষ্টভাবে বললেন, “বাঃ, বেশ! আমিও ঐ দিকেই যাব। আমায় নিয়ে যাবে? চিন্তা কোরো না, যা ভাড়া লাগে তা আমি দেব। তুমি গাড়িটা একটু নিচু করো, নইলে তো আমি উঠতে পারবো না!”

কাকাবাবু উঠে বসার পর মোষের গাড়িটা চলতে লাগল ঢিমে

তেতালায়। কাকাবাবু ছাউনির মধ্যে বসে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে।

সেই বৃষ্টি ভিজেই দু'জন সাইকেল-আরোহী আবার আস্তে আস্তে যেতে লাগল মোষের গাড়িটার পাশে পাশে। কাকাবাবুর দিকে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তারা পালিয়ে গেল শাঁ শাঁ করে।

কাকাবাবু বললেন, "আরেঃ!"

লোকদুটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই আবার সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে আসতে লাগল। তারা কাছাকাছি এসে পড়তেই কাকাবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, "এই যে, শোনো, শোনো!"

এবার তারা উল্টোদিক থেকে আসছে বলে গাড়ির পাশে পাশে চলতে পারে না। একজন থেমে পড়ল। কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, শোনো, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?"

লোকটি যেন কিছুই জানে না এইরকম ভাবে শুকনো মুখে বলল, "রাজকুমার? কোন্ রাজকুমার?"

কাকাবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "আমি যে-রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছি, তাকে তুমি চেনো না?"

লোকটি বলল, "কই, না তো!"

কাকাবাবু বললেন, "তবে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? যাও, ভাগো!"

ঠিক তক্ষুনি একটা জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সাইকেল-আরোহী আর কাকাবাবু দু'জনেই তাকালেন সেদিকে।

জিপটিও এসে থামল মোষের গাড়ির পাশে। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা লম্বামতন একজন লোক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

কাকাবাবু লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, তুমি জানো নাকি, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

লোকটি বললো, "হ্যাঁ, জানি। আমি রাজকুমারের কাছেই যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই! বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

মোষের গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওহে, জিপগাড়ি পেলে কে আর মোষের গাড়িতে যেতে চায় বলো! তোমার গাড়িটা নিচু করো, আমি নেমে পড়ি! এই নাও, তুমি দশটা টাকা নাও!"

কাকাবাবু জিপগাড়িতে বসলেন সামনের সীটে। পেছন দিকে তিনজন গুণ্ডামতন চেহারার লোক বসে আছে গম্ভীরভাবে।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, ব্যবস্থা বেশ ভালই। আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে তোমরা কি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে?"

কালো শার্ট পরা লোকটি বলল, "আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এই রাস্তায় আসব!"

কাকাবাবু আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "বাঘ জঙ্গলে বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লাগে। আনি জানতুম, আমি যে-দিকেই যাই না কেন, তোমরা ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে!"

কালো শার্ট পরা লোকটাও অকারণে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছোতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?"

লোকটি বলল, "অন্তত তিন ঘণ্টা তো বটেই। সন্ধে হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি এই সময়টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি। পৌঁছে গেলে আমায় ডেকে দিও।"

তারপর কাকাবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল। গাড়ির লোকগুলো এই এতটা সময় কোনো কথা বলল না। তবে তারা কেউ ঘুমোল না।

জিপটা শেষ পর্যন্ত থামতে কাকাবাবু জেগে উঠলেন নিজে থেকেই। সন্তুকে যে-বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু' জনের হাতে দাউ দাউ

করে জ্বলছে মশাল। সেই আলোতে কাকাবাবু চিনতে পারলেন রাজকুমারকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে কাকাবাবু রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে আবার দেখা হল! এত শিগগিরই যে দেখা হবে তা ভাবিনি। আশা করি এবারে আর মারা-মারি করার দরকার হবে না। সন্তুর চিঠি আমি পেয়েছি। আমি জঙ্গলগড়ের ম্যাপ দিয়ে দিলে তোমরা সন্তুকে ছেড়ে দেবে। আশা করি ভদ্রলোকের মতন তোমরা কথা রাখবে। এই নাও জঙ্গলগড়ের ম্যাপ।

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু ম্যাপটা বার করে এগিয়ে দিলেন রাজকুমারের দিকে।

২৬

রাজকুমারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছ' সাত জন লোক। আজ আর এদের ছদ্মবেশ ধরার কোনো চেষ্টা নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় এরা বেশ হিংস্র ধরণের মানুষ। ওদের পেছনে দেখা যাচ্ছে তিনটে ঘোড়া। সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে, আকাশ এখনো পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। মশালের আগুন কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাজকুমারের মুখখানা গম্ভীর, থমথমে। সে ম্যাপটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই কাকাবাবু নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "উহুঁঃ। আগে সন্তুকে ডাকো। তুমি সন্তুকে ফেরত দেবে, তারপর আমি তোমায় ম্যাপটা দেব, এইরকমই তো কথা!"

রাজকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রায়চৌধুরী, তোমার সাহস আছে বটে! এ-কথা মানতেই হবে! ভেবেছিলুম, তোমাকে তুলে আনবার জন্য আবার অনেক ঝামেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছ। তুমি খোঁড়া মানুষ, তাও একা। আমরা এখানে এতজন আছি। এবারে কিন্তু তোমাকে আর কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না! সে ব্যবস্থা করা আছে!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "বাঁচাবার প্রশ্ন উঠছে কী করে? তোমরা আমাকে মারবে কেন? তোমরা যা চেয়েছিলে, তা তো দিয়েই দিচ্ছি! ম্যাপ নাও। সন্তুকে ফেরত দাও!"

"বাঃ! তুমি কি আমাদের এতই বোকা পেয়েছ? ঐ ম্যাপটা যদি জাল হয়? সন্তুকে আমরা এ বাড়িতে আটকে রেখেছি। সে ভাল আছে। এই ম্যাপ অনুযায়ী তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তারপর সন্তুকে তুমি ফেরত পাবে!"

"আমাকে আবার অতদূর নিয়ে যাবে? তার চেয়ে এক কাজ করো না! আমিও এখানে সন্তুর সঙ্গে থাকছি। তোমরা এই ম্যাপ নিয়ে চলে যাও। গেলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক ম্যাপ দিয়েছি, না ভুল "দিয়েছি!"

"দেখি ম্যাপটা!"

"বললুম না, আগে সন্তুকে দেখাও, তারপর ম্যাপ পাবে?"

"কেন পাগলামি করছো, রায়চৌধুরী? আমরা তোমার কাছ থেকে ওটা জোর করে কেড়ে নিতে পারি না? দেরি করে লাভ নেই! চলো, রওনা হয়ে পড়া যাক!"

"আমাকে যেতেই হবে বলছ? তবে সন্তুকে ডাকো। সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।"

"না! সে ছেলেমানুষ, তাকে নিয়ে যাবার দরকার নেই!"

একটু আগে থেকেই চলন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় দু'জন অশ্বারোহী সেখানে এসে পৌঁছোল। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ছুটে এল রাজকুমারের কাছে। একজন ফিসফিস করে বলল, "কোথাও পাওয়া গেল না! সব জায়গায় তল্লাস করেছি—"

রাজকুমার সেই লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "অপদার্থ! উল্লুক!"

তারপর রাজকুমার চোখ ফেরাতেই দেখল কাকাবাবু তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন।

রাজকুমার বলল, "তোমার কাছে গোপন করে আর লাভ নেই। তোমার গুণধর ভাইপোটি পালিয়েছে। মহা বিচ্ছু ছেলে!"

কাকাবাবু বললেন, "পালিয়েছে? এটা কি সত্যি কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। ভোরবেলা সে চম্পট দিয়েছে। সারা দিন ধরে খোঁজা হচ্ছে তাকে। শুধু শুধু পালিয়ে তার কী লাভ হল? এই জঙ্গলের মধ্যে না খেয়ে থাকবে! বেশি দূর তো যেতে পারবে না!"

"এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই?"

"প্রায়ই ভাল্লুকের উপদ্রব হয়! বুঝতেই পারছ, আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আমরা তাকে ভালভাবেই রেখেছিলাম এখানে, কোনো অত্যাচার করিনি!"

"ওর চিঠিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখেছি। সেটা কার?"

রাজকুমারের পাশ থেকে 'কর্নেল' বলল, "রাজকুমার, শুধুমুদু কথা কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? এই বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলুন না!"

রাজকুমার বলল, "রায়চৌধুরী, ঘোড়ায় ওঠো। ঘোড়া চালাতে জানো নিশ্চয়ই। এক পায়ে পারবে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পারব। চলো তা হলে! কিন্তু তোমরা কথা রাখতে পারলে না!"

মোট পাঁচটা ঘোড়া। সেগুলোর পিঠে চড়ে পাঁচজন যাত্রা শুরু করল, আর বাকিরা রয়ে গেল সেখানেই।

কাকাবাবু ম্যাপটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, "এ সব রাস্তা তোমরাই ভাল চিনবে। তোমরাই পথ ঠিক করো। আসল জায়গায় পৌঁছে তারপর আমি দেখব।"

রাজকুমার আবার ম্যাপটা 'কর্নেল'-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এটা দেখে আগে আগে চলো!"

'কর্নেল' পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "এ জায়গাটা তো আমার চেনা!"

রাজকুমার বলল, "জায়গাটা তো আমিও আগে দেখেছি। কিন্তু

সেখানে গোপন একটা দরজা আছে। তার সন্ধান শুধু এই রায়চৌধুরীই জানে।"

তারপর শুরু হল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। মশালগুলো ওরা নিভিয়ে ফেলেছে। আকাশে অল্প জ্যোৎস্না আছে। জঙ্গলটাকে মনে হচ্ছে ছায়ার রাজ্য।

'কর্নেল' চলেছে আগে আগে। কাকাবাবুকে মাঝখানে রেখে ঠিক তার পেছনেই রয়েছে রাজকুমার। তার হাতে রিভলবার।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ 'কর্নেল'-এর ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি ডাক তুলে সামনের দু'পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কর্নেল' টর্চের আলো ফেলল সামনে। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ঘোড়াটা আর যেতে চায় না।

রাজকুমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

'কর্নেল' বলল, "মনে হচ্ছে সামনে কোনো বড় জানোয়ার আছে। ঘোড়া ভয় পেয়েছে।"

রাজকুমার বলল, "গুলি চালাও! যাই থাক না কেন, সরে যাবে!"

'কর্নেল' বলল, "যদি হাতির পাল থাকে? তা হলে গুলি চালালে তো আরও বিপদ হবে!"

রাজকুমার বলল, "না, না, এ জঙ্গলে হাতির পাল নেই, আমি জানি! চালাও গুলি!"

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরপর দু'বার গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ হল। অনেক দূরে যেন একটা হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল। আর কিছু না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোতে লাগল ওরা। এক জায়গায় নদী পার হতে হল। 'কর্নেল' মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ম্যাপ দেখে নিচ্ছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তারা পৌঁছে গেল জঙ্গলগড়ে। সবাই ঘোড়া থেকে নামবার পর আবার জ্বালানো হল মশাল।

রাজকুমার বলল, এ জায়গাটায় আমি আগে অন্তত তিনবার এসেছি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাইনি। রায়চৌধুরী, তুমি

ধোঁকা দিচ্ছ না তো? এটাই আসল জঙ্গলগড়? উদয়পুরের কাছে যেটা, সেটা নয়?

কাকাবাবু বললেন "এক সময়ে এখানেই আমি তাঁবু গেড়ে ছিলাম কয়েকদিন।"

রাজকুমার বলল, "সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু তুমি আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছ। স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "এখানেই!"

"তবে গুপ্তধন কোথায় আছে, চটপট দেখিয়ে দাও!

"গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানতে পারলে এখানে ফেলে রেখে যাব কেন? সেবারেই তো নিয়ে যেতে পারতুম!"

"গুপ্তধনের সন্ধান তুমি পেয়েছিলে ঠিকই। তুমি চেয়েছিলে একলা তা উদ্ধার করতে। তোমার সঙ্গে যারা দিল, তাদের জানতে দিতে চাওনি। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে—"

এই সময় কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে দপ্ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। তারপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ঠিক আগেকার দিনের সৈন্যের মতন সাজপোশাক পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তাদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা। আর তাদের পেছনে দেখা গেল আর একজন লোককে। এর গায়ে মখমল আর জরির পোশাক। মাথায় মুকুট। অনেকটা যাত্রাদলের রাজা কিংবা সেনাপতির মতন দেখতে। হাতে খোলা তলোয়ার।

সেই লোকটিকে দেখেই রাজকুমারের সঙ্গীরা সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল। রাজকুমার বলল, "আসুন স্যার!"

কাছে আসার পর লোকটিকে চিনতে পেরে কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "শিশির দত্তগুপ্ত!"

পুলিশের বড়সাহেব শিশির দত্তগুপ্ত এই রকম পোশাক পরার পর তাঁর চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। মুখের হাসিটাও অন্যরকম। এক দিকের ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে তিনি বললেন, "আমি সেনাপতি দেবেন্দ্র

বর্মার বংশধর! রাজা অমরমাণিক্যের লুকনো ধনসম্পদের আমিই উত্তরাধিকারী!

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এমন মজা তিনি বহুদিন পাননি!

রাজকুমার কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, "চুপ কর, বেয়াদব! ওঁর সামনে তুই হাসছিস!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "এই! ওঁর গায়ে হাত তুলো না! উনি ভদ্দরলোক। উনি নিজেই সব দেখিয়ে দেবেন! মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বিদেশী! আমাদের ধনসম্পদের ওপর আপনার কোনো অধিকার নেই। আপনি জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিন। তারপর আপনাকে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? আপনার পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি, তারপরও আপনি আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন? আপনি এত বোকা? আপনি পুলিশের বড়কর্তা, তাই এইসব গুণ্ডা বদমাইশগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সেইজন্যই এরা এত বেপরোয়া!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "আমরা বনেদি বংশের লোক। কথা দিলে আমরা কথা রাখি। আমি ত্রিপুরেশ্বরীর নামে শপথ করছি, আপনার কোনো ক্ষতি করা হবে না। আমাদের কাজ উদ্ধার হলেই আপনাকে আমরা সসম্মানে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "আর যদি কাজ উদ্ধার না হয়?"

শিশির দত্তগুপ্ত এবারে তাঁর তলোয়ারটা কাকাবাবুর বুকের কাছে তুলে কর্কশভাবে বললেন, "তা হলে এক কোপে আপনার মুণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর আমার কপালে যা-ই থাক!"

২৭

কাকাবাবু হঠাৎ ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারতেই তলোয়ারটা শিশির দত্তগুপ্তর হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

রাজকুমার আর অন্যরা দৌড়ে এসে কাকাবাবুকে চেপে ধরল। 'কর্নেল' কাকাবাবুকে মারবার জন্য ঘুঁষি তুলতেই কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দাঁড়াও! আমি তোমাদের গুপ্তধনের গুহা দেখিয়ে দিচ্ছি!"

রাজকুমারের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন, "তোমরা কথা রাখতে শেখোনি! সন্তুকে ফেরত দেবার কথা ছিল তোমাদের!"

শিশির দত্তগুপ্তর দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি সেনাপতি বংশের ছেলে! সেনাপতির মতন পোশাক পরলেই সেনাপতি হওয়া যায় না। তলোয়ারটা শক্ত করে ধরতেও শেখেননি?"

রাজকুমার বলল, "তোমার চালাকি অনেক দেখেছি! আর বেশি বকবক করতে হবে না! এবারে ভালয়-ভালয় জায়গাটা দেখাও!"

শিশির দত্তগুপ্ত হুকুম দিল, "ক্রাচ দুটো কেড়ে নাও ওর কাছ থেকে!"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে, তলোয়ার ঠিকমতন ধরতে না শিখলে ও জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। এখান থেকে আরও খানিকটা দূরে যেতে হবে।"

একটা ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন কাকাবাবু। একজন মশলাধারী চলল তাঁর আগে আগে। আর বাকি সবাই পেছনে পেছনে। শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে খাপে ভরে নিয়েছে। এখন তার হাতে একটা রিভলভার। সেই রিভলভারের নল কাকাবাবুর পিঠে ঠেকানো।

কাকাবাবু বললেন, "সেই গুপ্তধন পেলে কে নেবে? আপনি, শিশিরবাবু, সেনাপতির বংশ। আর, রাজকুমার বলেছে, সে রাজবংশের ছেলে। তা হলে?"

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, "সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "রাজা অমরমাণিক্য বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তাঁর জিনিসপত্র এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেউ তার সন্ধান না পায়। সকলেই ভাবে যে, দেয়ালের গায়ে বা পাথরের

ওপরে কোথাও কোনো বোতাম-টোতাম থাকবে, সেটা টিপলেই দরজা খুলে যাবে। সেই রকম ভাবে গুপ্তধন খুঁজতে এসে বহুলোক এখানকার বাড়িঘর সব ভেঙেই ফেলেছে। এই যে ডান দিকের বড় পাথরটা, এর গায়েও গাঁইতির দাগ। আসলে এখানে সেরকম কিছুই নেই। যা কিছু আছে, সবই মাটির নীচে। মশালটা নীচের দিকে দেখাও, এখানে কোথাও একটা ঈগলপাখি আঁকা আছে!"

অমনি দু'তুটো মশাল নীচে নেমে এল, সবাই এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সেখানে কোনো পাখিটাখির ছবি পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। মশালের আলোতে যে-টুকু দেখা যায়, তা ছাড়া আর সব দিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের চাঁদও মেঘে ঢাকা পড়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "পেলে না? তাহলে কি ছবিটা মুছে গেল? না। তা তো হতে পারে না। ভাল করে দেখোতো এখানে একটা বড় তেঁতুলগাছ আছে কিনা?"

কিন্তু সেখানে কোনো তেঁতুলগাছও নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে, গাছটা কেউ কেটে নিয়ে গেছে। জঙ্গলের গাছ তো অনবরতই লোকরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে! তা হলে চলো তো পাথরটার ওদিকে।"

কাছাকাছি কোনো পাহাড় না থাকলেও সেখানে একটা বেশ বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে।

সেই পাথরের ওদিকটায় যেতেই মশালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা রুমাল।

একজন লোক দৌড়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিল। শিশির দত্তগুপ্তর কাছে এনে সে বলল, "স্যার, এই রুমালটা টাটকা। আজই কেউ ফেলে গেছে!"

শিশির দত্তগুপ্ত রুমালটা মেলে ধরল। তার এক কোণে ইংরিজি অক্ষরে 'ভি' লেখা।

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে আরও কেউ আজ এখানে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল। ত্থাখো, সে আবার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না!"

চারদিকে মশাল ঘুরিয়ে দেখা হল, মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু একদিকে একটা তেঁতুলগাছ আছে। রুমালটা পড়ে ছিল সেই গাছটার কাছেই।

কাকাবাবু সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছটার গোড়ার কাছে বসে পড়ে বললেন, "এই তো ঈগলপাখির ছবি!"

সবাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে শিশির দত্তগুপ্তকে বললেন, "দেখি আপনার তলোয়ারটা।"

শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে দিতেই কাকাবাবু সেটা তুলে ধরে বললেন, আপনারা জঙ্গলগড়ের চাবি খুঁজছিলেন, এই দেখুন, এটাই জঙ্গলগড়ের চাবি। দেখবেন?

শুধু মাটির ওপরেই বেশ বড় একটা ঈগলপাখি আঁকা। মাটি কেটে কেটে তার ওপর চুন বা ঐ জাতীয় কিছু ছড়িয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছিল, বৃষ্টির জলে রং টং ধুয়ে মুছে গেলেও এখনো পাখির আকারটা বোঝা যায়। পাখির চোখ দুটো পাথরের।

কাকাবাবু তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে পাখিটার ডান চোখটা তোলার চেষ্টা করলেন। সেটা সহজেই উঠে এলো। সেই ফুটো দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে কাকাবাবু গর্তটাকে বড় করতে লাগলেন। তাতেও বিশেষ অসুবিধে হল না। গর্তটা হাত ঢোকাবার মতন বড় হতেই কাকাবাবু তার ভেতর থেকে একটা তামার নল টেনে বার করলেন।

তারপর বললেন, "সেই অতদিন আগেও কী রকম চমৎকার কপিকল ব্যবস্থা ছিল দেখো! এটা দিয়ে কাজ সারতে বেশি গায়ের জোর লাগে না। একটা বাচ্চা ছেলেও পারবে।

কাকাবাবু সেই তামার নলটা ধরে ঘোরাতে লাগলেন। কয়েক পাক ঘুরিয়েই বললেন, "কাজ হয়ে গেছে। এবারে ত্থাখো!"

সবাই হাঁ করে ঈগলপাখির ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই ঘটল না।

শিশির দত্তগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ঐ পাথরটার কাছে আলো নিয়ে দেখুন! এখানে কী দেখছেন!"

মশালের আলো সেদিকে নিতেই দেখা গেল যে, পাথরের চাঁইটা খানিকটা সরে গেছে, সেখানে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই ছুটে গেল সেদিকে। গর্তটার ভেতরে অন্ধকার। ভেতরে কিছুই দেখা যায় না।

কাকাবাবু সেখানে গিয়ে বললেন, "এটা হল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। সুড়ঙ্গটা সোজা নয়। এখান থেকে নীচে নামলেই সামনের দিকে আসল সুড়ঙ্গটা দেখা যাবে।

সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে সেই গর্ত দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, শিশির দত্তগুপ্ত রিভলভার তুলে বলল, "খবর্দার! আর কেউ যাবে না। প্রথমে শুধু আমি যাবো!"

'কর্নেল' বলল, "স্যার, প্রথমেই আপনি যাবেন? ভেতরে যদি সাপখোপ থাকে?"

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, "যাই থাকুক, প্রথমে আমি গিয়ে দেখব। দরকার হলে তোমাদের ডাকব। কারুর কাছে টর্চ আছে?"

কেউ টর্চ আনেনি। কাকাবাবু নিজেই তাঁর পকেট থেকে একটা সরু টর্চ বার করে বললেন, "এটা দিতে পারি। এবারে আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

শিশির দত্তগুপ্ত কাকাবাবুর কাছ থেকে টর্চটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কঠোরভাবে বলল, "একে ধরে রাখো। পালাবার যেন চেষ্টা না করে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব। আমি ভেতর থেকে যদি ডাকি, তা হলে তোমরা কেউ যাবে।"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, সেই গর্তটা এক-মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি গভীর! ওপর থেকেই সবাই দেখতে পেল, শিশির দত্তগুপ্ত

সেই গর্তের মধ্যে নেমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সেই কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটা দিয়ে কাকাবাবু হাওয়া খেতে লাগলেন। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল, এখন মুখখানা বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা। তবু প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, শিশির দত্ত-গুপ্তর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

গর্তটার মুখের কাছে মুখ দিয়ে রাজকুমার চিৎকার করে ডাকল, "স্যার! স্যার!"

কোনো উত্তর এল না।

রাজকুমার এইরকম ডেকে চলল অনেকবার। তার ডাকেরই খানিকটা প্রতিধ্বনি শোনা গেল কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই।

রাজকুমার বলল, "কী হল? স্যার কোনো উত্তরও দিচ্ছেন না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কী জানি! সে তোমাদের স্যারের ব্যাপার।"

'কর্নেল' বলল, "আর একজন কারুর ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার।"

রাজকুমার বললো, "তোমরা থাকো। আমি যাচ্ছি।"

রাজকুমারও গর্তে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে। ওপর থেকে 'কর্নেল' জিজ্ঞেস করল, "কী হল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, রাজকুমার?"

ভেতর থেকে শোনা গেল, "বড্ড অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

'কর্নেল' বলল, "আমরা ডাকলে সাড়া দেবেন। স্যারের টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন না?"

রাজকুমারের কাছ থেকে আর কোনো উত্তর এল না। এবার 'কর্নেল' শুরু করল ডাকাডাকি। রাজকুমার একেবারে নিশ্চুপ।

'কর্নেল' মুখ তুলে বলল, "কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছে। সেইজন্য সাড়া দিচ্ছে না। সাপ-টাপ থাকলেও সঙ্গে-সঙ্গেই তো কিছু একটা হয়ে যায় না!"

কাকাবাবু বললেন, "এবারে তুমি নেমে দেখবে নাকি?"

'কর্নেল' বলল, "নিশ্চয়ই। আমি কি ভয় পাই?"

'কর্নেল'-এর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে নামিয়ে রেখে সে গর্তটার মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিল। তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে প্রথমেই সুড়ঙ্গে না ঢুকে সেখান থেকেই ডাকতে লাগল, "স্যার! রাজকুমার! আপনারা কোথায়?"

কোনো উত্তর না পেয়ে সে সুড়ঙ্গে মাথা ঢোকাতেই কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে।

অন্য যারা ছিল, তারা দারুণ ভয় পেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কাকাবাবু তাদের বললেন, "ওহে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো পালাও! ভেতরে জুজু আছে মনে হচ্ছে।"

লোকগুলো কী করবে ঠিক করতে পারছে না। তখুনি দেখা গেল গর্তটার ভেতর থেকে কার মাথা বেরিয়ে আসছে। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাতটা দাও, আমি টেনে তুলছি।"

গর্ত থেকে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। তাঁকে দেখেই 'কর্নেল'-এর দলবল দৌড় মারল।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "যাক, ওগুলো যাক। আস্‌লি চাঁই গুলো ধরা পড়ে গেছে! খুব বুদ্ধি বার করেছিলে তুমি, রাজা!"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, শিশির দত্তগুপ্তই নাটের গুরু। পুলিশের কর্তা বলেই ও বড় বড় সব ক্রিমিনালকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। তোমার রুমালটা প্রথমে না দেখতে পেয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম।"

নরেন্দ্র ভার্মা গর্তের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কেয়া হুয়া? উ লোগকো বাঁধকে উপারে লে আও!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে থাকতে তোমার কষ্ট হয়নি তো? দুটো বেশ বড় বড় ঘর।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে এবারে সারপ্রাইজ দেব, রাজা! বলো তো ভিতরমে কে কে আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে?"

নরেন্দ্র ভার্মা একগাল হেসে বললেন, "সন্টু! দ্যাট নটি বয়!"

কাকাবাবু সত্যিকারের অবাক হয়ে বললেন, "সন্তু? ওর ভেতরে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ! কেয়া আজিব বাত্! ও ছেলেটার কিন্তু বুদ্ধি সাঙ্ঘাতিক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু এখানে? ও সুড়ঙ্গের পথই বা কী করে জানল?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "জানেনি। লেকিন, আর একটু হলেই জেনে ফেলত। তোমার ম্যাপ পেয়ে তো আমি দলবল নিয়ে বিকালেই এখানে পঁহুছে গেছি। তুমি শর্টকাট রাস্তা বাতলে দিয়েছিলে। এখানে এসে দেখি, ঐ ঈগলের পাথরের আঁখ নিয়ে সন্তু নাড়াচাড়া করছে। পাশে অন্য একটা লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু কি রাজকুমারের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ। তারপর গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক এখানে হাজির হয়ে গেছে। ওদের দু'জনকেও আমরা সুড়ঙ্গের অন্দরমে নিয়ে গেলাম! ঐ তো সন্তু উঠছে।

তলা থেকে কেউ ঠেলে তুলেছে সন্তুকে, দু'হাতের ভর দিয়ে সে ওপরে উঠে এল। তারপর কাকাবাবুর দিকে চেয়ে সে লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছিস তো? কোথাও লাগে-টাগেনি তো?"

সন্তু বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "এবারে সত্যিই তোর জন্য চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম। এ লোকগুলো বড় সাঙ্ঘাতিক। চল্, কালই ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তোর স্কুল খুলে গেছে না?"

সন্তু বলল, "স্কুল না, কলেজ!"
